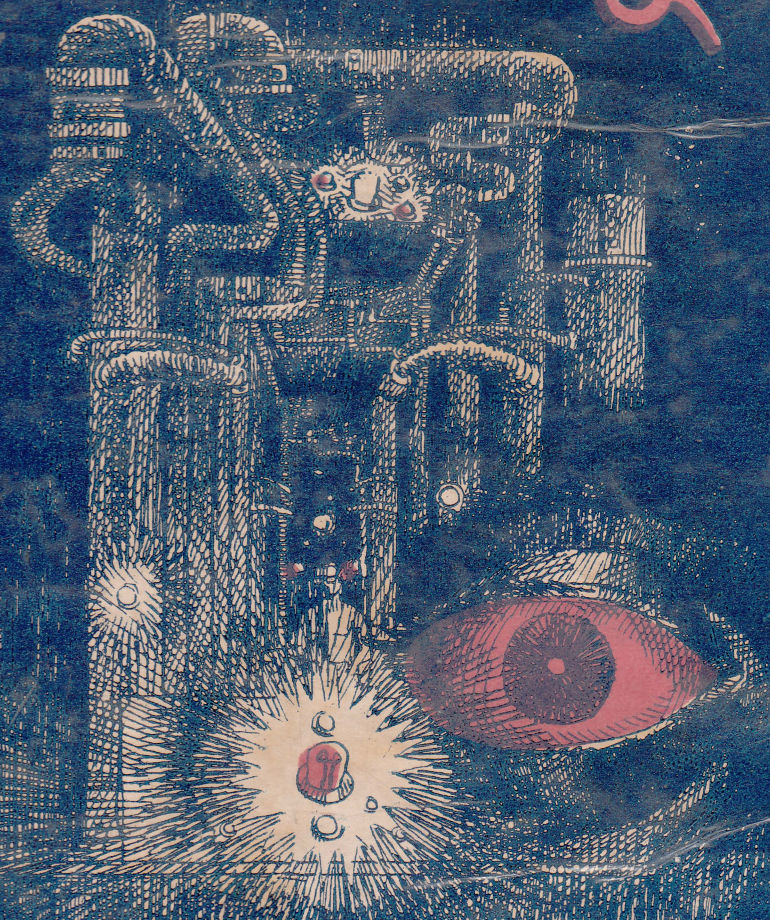
# কালপুরুষের চুল্লী

বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী



# কালপুরুষের চুল্লী

বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী



শিলালিপি
৫১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা—নয়

অলংকরণ ও প্রচ্ছদ  মদন সরকার

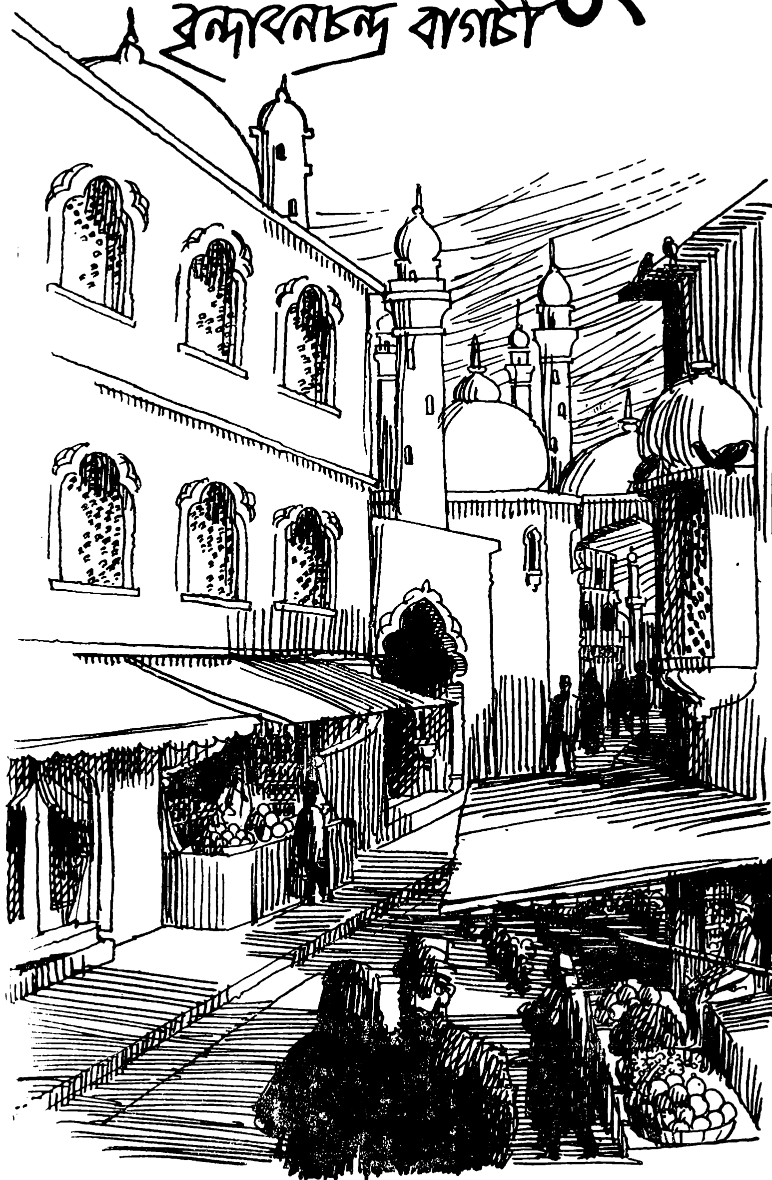
প্রকাশ কাল মে, ১৯৮৪ :  জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১

প্রকাশক অরুণকান্তি ঘোষ শিলালিপি ৫১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট কলকাতা ৯
মুদ্রণ পঞ্চানন জানা জানা প্রিন্টিং কনসার্ন ৪০/১ বি শ্রীগোপাল মল্লিক লেন কলকাতা ৯

মূল্য : আট টাকা

# কালপুরুষের চুল্লী

বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী



**মাথার** মধ্যে অঙ্কটা খালি ঘুরছিল—আর তালগোল পাকাচ্ছিল। ওরই মধ্যে মনের ভেতর একটা দারুন আশার সুরও বাজছিল। হয়ত এই অঙ্কটার জন্যেই একদিন পৃথিবীর একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী হিসাবে নাম হয়ে যাবে। অসম্ভব কি—। এসেছিলাম ডাক্তারী করতে —হয়ে গেছি কলেজের অধ্যাপক। আবার আমার বরাত টেনে নিয়ে গেছে গবেষণার রাস্তায়। হয়ত এই রাস্তা ধরে এগোতে এগোতে নামজাদা বিজ্ঞানীদের সারিতে গিয়ে পৌছে যাব। হাঁটছি আর ভাবছি।

তাহলে ব্যাপারটা খুলেই বলি। হাঁটছিলাম ইজিপ্টের রাজধানী কায়রো শহরের পুরাতন রাস্তা ধরে। শহরের এদিকটা সেই মধ্য-যুগেই রয়ে গেছে। আধুনিক হয়ে ওঠেনি। এদিকটা হল আবদিন প্রাসাদের উত্তর ধার ঘেঁসে। এখানে এলে মনে হয় সেই আরব্য উপন্যাসে আঁকা ছবি গুলোর শহরে এসেছি। ঘিঞ্জি ঘিঞ্জি বাড়ী ঘর—কোনটার মাথায় গম্বুজ। ছোট ছোট ঝরোকা ( জানালা )। যেখানে সেখানে সরাইখানা—ইয়া ইয়া জালা—ঢুকবার মুখেই। তাঁবুর মত পর্দা দিয়ে ছোট নোংরা রাস্তার অর্দ্ধেকখানা পর্যন্ত ঢাকা। তার নীচে বসে দু চারজন কিছু খাচ্ছে। পেট মোটা চামড়ার শিশি ঝুলছে গলায় দড়ি বেঁধে। পাথর ওঠা রাস্তা—হাঁটতে হাঁটতে ঠোক্কর খেতে হয়। এদিককার চেহারা এই, আবার দক্ষিণ দিকটায় যাও একেবারে উলটো। আধুনিক ফ্যাসানের বাড়ী, চওড়া রাস্তা, ঝল-মলে দোকান জিনিষপত্র সবই আমেরিকা ফ্রান্স অথবা ইংলণ্ডে তৈরী।

কিন্তু আপাততঃ আমার যাওয়ার জায়গা হল ঐ পুরাতন আরব্য-উপন্যাসের শহরের একটা বাড়ী।

বছর চারেক আগে এই কায়রো শহরের এক ব্যবসায়ী ফার্মের সঙ্গে চুক্তি করে ডাক্তারী করতে এসেছিলাম। দেখে অহংকার করতে নেই—কিন্তু সত্যি কথাটা বলতেই হয়। আমি স্বভাবে খুব আমুদে মিশুক আর আড্ড্াবাজ তাই শহরের অনেক লোকের সঙ্গে আমার

পরিচয় থেকে একেবারে যাকে বলে গলায় গলায় ভাব, তাও হয়ে গিয়েছিল। আর ভাষা শেখাটা আমার একটা বাতিক—তাই এখানকার চলতি ভাষা আরবী ভাষাও আমার বেশ রপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

মাঝে মাঝেই আল আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ওখানকার লাইব্রেরীতে পুরানো পুঁথিপত্তর ঘাঁটতাম—আধুনিক অধ্যাপক আর পুরাতন মৌলানাদের সঙ্গেও অনেক বিষয় গল্প করতাম। ওখানেই আলাপ হয়েছিল মামুদ বে'র সঙ্গে। ভদ্রলোক মস্ত বড় ব্যবসায়ী কিন্তু সমাজ সেবাতেও বেশ মন আছে। ওর বাড়ীটা হল রোডা দ্বীপে। রোডা হল নীল নদের একটা দ্বীপ। এখানকার অধিবাসীদের গর্ব। এই রোডা দ্বীপে দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন এসেছিলেন ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু দখলে রাখতে পারেন নি। পরে তিনি চলে গেলে মিশরীরা ওটাকে দখল করে নেয়। সেই থেকে তাদের অধীনেই আছে।

সেই রোডা দ্বীপে একটা আধুনিক পড়াশুনার জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন মামুদ বে। যোগ্য অধ্যাপক পাওয়া এক সমস্যা। মিশরীদের মধ্যে অনেকেই আল আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। যার বেশীর ভাগই সেই পুরাতন ঢংয়ের পড়া। সেইজন্য মামুদ বে বিদেশী শিক্ষিত মানুষ দেখলে খোঁজ খবর করতেন খুবই। কথায় কথায় একদিন যখন শুনলেন যে আমি অঙ্ক আর ফিজিক্স দুটো নিয়েই এম. এস. সি. পাশ করেছিলাম তখনই তাঁর মনে মতলব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। আমার চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার প্রায় দু'মাস আগে মামুদ আমার বাসায় এসে হাজির। আমিত অবাক! কি ব্যাপার! এতবড় ব্যস্ত লোক নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে আড্ডা মারবার জন্য এখানে আসেন নি। তাই জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার মামুদ সাহেব। এই গরীব খানায় হঠাৎ।

মামুদ হেসে বলল—সবুর কর সব কথা হবে। আগে বল আমাদের এই শহর তোমার কেমন লাগল। বেশ লাগল—আমি উত্তর দিলাম। আপনার মত এরকম আরও কয়েকজন বিদ্বান লোক তাঁদের সঙ্গ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন।

এইবার একগাল হেসে থুতনির সরু দাড়িটা নেড়ে তিনি বললেন—তাহলে আরও দুচার বছর থেকে যাওনা কেন।

—আমার কাজের মেয়াদ শেষ হয়ে এল। আর মাস দুই বাকী।

কি যে বল—মামুদ বলেন—কাজের কি শেষ আছে? এক যায় এক আসে। তুমি আর এক কাজ নাও। আমাদের কলেজে ফিজিক্সের প্রফেসার হও। বলে চোখ ছোট করে মিঠি মিঠি হাসতে লাগলেন।

প্রস্তাবটায় হঠাৎ আমায় একটু থেমে যেতে হল—মামুদ আমাকে ভাববার সময় না দিয়ে বললেন—ভাববার কিছু নেই অনেকদিন ত রোগী ঠেঙ্গালে এবার না হয় ছাত্র ঠেঙ্গাও। বিদ্যার ত অভাব নেই। বললাম—অনভ্যাসে বিদ্যা কমে গেছে।

—আবার মগজে শান দিয়ে নাও ঠিক পারবে। অন্ততঃ বছর পাঁচেকের জন্য।

—আর ভাবতে হবে না—মামুদ একেবারে ব্যাগ থেকে সব ফরম বের করে ফেললেন। ব্যস্ জীবনের রাস্তা আর একদিকে মোড় নিল। ছিলাম ডাক্তার হয়ে গেলাম প্রফেসর। ভালই লাগল পড়াশোনা করে ক্ষয়ে যাওয়া ফিজিক্সের বিদ্যাকে চাঙ্গা করে তুললাম। ছাত্রমহলে খুব সুনাম হয়ে গেল।

সবাই বলত ডাঃ বাগচী খুব সহজ করে কঠিন বিষয় বোঝাতে পারেন। গর্বে আমার বুকটা ফুলে উঠত।

এ পর্যন্ত বেশ চলছিল—হঠাৎ মাথায় চাপল গবেষণার ভূত। আর সেই ভূতের তাড়াতেই এই কাহিনীর নায়ক হয়ে গেলাম।

একদিন আল আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ে এক মৌলানা আমাকে বলল—তোমরা বল নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু জান আমাদের পুরাতন মিশরীরা ওকথা অনেক আগেই জানত। আমি বললাম তাই নাকি—তা একথা আপনারা আগে প্রচার করেননি কেন?

মৌলানা বললেন তুমি হয়ত ব্যঙ্গ করছ কিন্তু তোমরা আজও ভেবে পাওনা পিরামিড তৈরী করবার সময় অত উঁচুতে মানে ধর পাঁচশ ফিট উঁচুতে ঐসব ঠিক সাইজ করে কাটা মসৃণ পাথর নিয়ে যাওয়া,

হত কি করে। আমি বললাম হ্যাঁ একথা ঠিক—এনিয়ে লোকে বিস্ময় প্রকাশ করে।

মৌলানা তার লম্বা দাড়িতে আঙ্গুল দিয়ে চিরুনীর মত করে আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললেন ওরা ঐ পিরামিড তৈরী করবার সময় অনেকখানি জায়গা জুড়ে পৃথিবীর আকর্ষণ কমিয়ে ফেলেছিল। তারফলে পাথর হালকা হয়ে গিয়েছিল। মাধ্যাকর্ষণ না জানা থাকলে তারা এসব পারল কি করে।



কথাটা সত্যিই বটে।

মৌলানাকে বললাম এবিষয়ে কিছু বইয়ের সন্ধান আছে।

মৌলানা বললেন আছে—তবে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। অনেক অঙ্ক আছে তাতে। আমার আগ্রহ বেড়ে গেল—মৌলানাকে বিশেষ অনুরোধ করলাম বইটা দেখাতে। প্রথমে স্বীকার করল না গুনাহ হবে ভয়ে। পরে যখন বোঝালাম যে এতবড় ব্যাপারটা সবাই জানলে পৃথিবীময় মিশরীদের ধন্য ধন্য করবে, তখন স্বীকার করল।

বইখানা পেয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম ছয় মাস ধরে। পুরাতন মিশরী লিপি পড়তে পারেন এমন মানুষেরও সাহায্য নিলাম। তারপর মোটামুটি ঐ অঙ্ক থেকে একটা অঙ্ক খাড়া করলাম—যা দিয়ে পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ আর কেন্দ্রানুগ শক্তি (Centrifugal এবং Centripital force ) সম্বন্ধে একটা নূতন ধরনের সন্ধান পাওয়া যায়। এই অঙ্ক থেকেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কমান বাড়ানর ব্যাপারে কিছু হিসাব করা যায় কিনা তাতে লেখা পড়লাম।

তোমরা সবাই বোধহয় জাননা যে বিখ্যাত বিখ্যাত অনেক আবিস্বারই প্রথম দিকে অঙ্কের আকারেই থাকে—পরে আবিস্কারের রূপ নেয়। এই কথায় এসে পড়ে মেসিনগান আবিস্কারের কথা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সে ১৯১৫-১৯১৬ সালের কথা। ইংলণ্ডের এক অঙ্কের পণ্ডিত হিসাব করে দেখলেন বন্দুক থেকে যখন গুলি বেরোয় তাতে নলের ভিতরে কতখানি তাপ আর চাপ সৃষ্টি হয়। তিনি অঙ্ককষে হিসাব করলেন যে ঐ তাপ আর চাপে যে গতি ( Velocity ) সৃষ্টি হয় ওটাকে নষ্ট না করে যদি ঘুরিয়ে আনা হয় তবে আর একটা গুলি ঐ শক্তিতেই ছুটতে পারে। ফলে বারুদ খুব কম হলেও গুলি ছুটবে। তাতে বারুদ আর সময় দুইই বাঁচবে। আর বারবার অনেক গুলি ছুটবে। ভদ্রলোক বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে বললেন আমার এই অঙ্ক নিয়ে ইনজিনিয়ারদের কাছে দেওয়া হোক তাঁরা এই ফর্মুলা মাফিক যন্ত্র তৈয়ারী করুন। অস্ত্র বিভাগের ইনজিনিয়ার বললেন এখন যুদ্ধ চলছে আমাদের সময় কম—এই সময় কি বুনোহাঁসের পিছনে দৌড়ানো চলে। ঘরের দুয়ারে জার্মানরা হানা দিচ্ছে। পণ্ডিত খুব চটে গেলেন বললেন জার্মানদের হঠানোর জন্যই ত এটা দরকার।

যাইহোক পণ্ডিতের ফর্মুলা নস্যাৎ করে দেওয়া হল। রেগে মেগে তিনি তাঁর কাগজপত্র নিয়ে চলে এলেন। রাগবারই কথা—এতদিন খেটেখুটে তিনি অঙ্ক কষলেন আর ওরা একেবারে উড়িয়ে দিল। পণ্ডিত বললেন আচ্ছা দেখা যাক আমার কথা না শুনে তোমাদের কি লাভ হয়। বছরখানেক পরে জার্মানরা যুদ্ধে একরকম বন্দুক ব্যবহার করতে লাগল। মিনিটে ষাটটা গুলি ছুটে আসে। ইংরাজেরা তাজ্জব। এ আবার কেমন বন্দুকরে বাবা। তখন খোঁজ পড়ল সেই পণ্ডিতের। জানা গেল তাঁকে অগ্রাহ্য করবার পরই তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন। যুদ্ধ শেষে সব ঘটনা পরিস্কার হল। নিজের দেশে পাত্তা না পেয়ে তিনি জার্মানী চলে গিয়েছিলেন আর জার্মান সামরিক বিভাগ তাঁর অঙ্ক নিয়ে তৈরী করেছিল মেসিনগান, যা ইংরেজরা হেলায় নষ্ট করেছিল।

যাইহোক, বুঝতে পারলে যে মস্ত বড় বড় আবিস্কারের গোড়াতে থাকে অঙ্ক। যা অনেক সময় পাকা মাথাওয়ালা লোকও বুঝতে পারেনা। আমার মাথায় তখন এসে গেছে সেই পিরামিড তৈরীর কথা। ব্যাপারটা যাইহোক না কেন ওরা বলছে পাথরটাকে ওরা হাল্কা করেছিল। আমি ভাবলাম আচ্ছা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ যদি জায়গায় জায়গায় বাড়িয়ে দেওয়া যায় তবে সামরিক দিক থেকে সাংঘাতিক কাজ করা যেতে পারে।

মনে করা যাক একটা শহর সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যার উপরে আকাশ পথে আক্রমণ হতে পারে আবার দূর পাল্লার কামানের গোলা আসতে পারে। এমন শহরের চারপাশে যদি বালার মত করে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি বাড়িয়ে দেওয়া যায় তবে মজাটা কি হবে। দূর থেকে শত্রুপক্ষের গোলা আসছে হিস হিস করে, অথবা উড়ন্ত রকেট, যেই ঐ বালার মধ্যে এসে পড়বে আর সঙ্গে সঙ্গে সবেগে মাটিতে পড়ে ফেটে যাবে। সেইখানে যদি গভীর পরিখা খুঁড়ে রাখা যায় তবে সব কিছু তারই মধ্যে পড়বে শহর অক্ষত থাকবে। এরোপ্লেনের ব্যাপারেও ঐ একই কথা। তাহলে বুঝতেই

পারছ এইসব আবিস্কারের আশায় আমার মনের অবস্থা তখন কি হয়েছিল।

* * *

অঙ্ক কষতে কষতে কিছুদূর এসে ঠেকে গেলাম। খুবই কঠিন ব্যাপার। আমার বুদ্ধিতে আর কুলোচ্ছে না কারও সাহায্য নেওয়া দরকার—কিন্তু পাচ্ছি কাকে। ইজিপ্টে তখন অঙ্ক জানা যাঁরা ছিলেন কেউই এ অঙ্কের কোনও সুবিধা করতে পারবেন না। ভাবলাম কম্পিউটারের সাহায্য নিতে হবে।

তোমরা অনেকেই আজকাল কম্পিউটারের নাম শুনেছ—কি করে ব্যবহার করা হয় তাও কিছু কিছু জেনেছ। কলিকাতায় একটা প্রদর্শনীতে রাশিয়ানরা একবার একটা ক্ষুদে কম্পিউটার এনেছিল। অনেককে অনেক কথার উত্তর দিয়ে চমকে দিয়েছিল। খুব উঁচু দরের কম্পিউটার মহাকাশ যান চালানোর হিসাবের সময় ব্যবহার করা হয়। এত সূক্ষ্ম আর নির্ভুল হিসাব কম্পিউটারে পাওয়া যায়।

কিন্তু অত ভাল যন্ত্র ত ইজিপ্টে পাওয়া যাবে না। তারজন্যে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতিতে যেতে হয়। তাই ভাবছিলাম আমার অঙ্কগুলো আমার বন্ধু এডলফ হানসের কাছে পাঠিয়ে দেব। এডলফ হানসের নাম তোমরা অনেক লেখাতেই পেয়েছ। হাইডেল-বুর্গের সেই বিখ্যাত বিজ্ঞানী।

হঠাৎ সেই দিনই সকালে কায়রোর একমাত্র ইংরাজী কাগজ 'দি নাইলে' এক বিজ্ঞাপন দেখে আনন্দে নাচতে ইচ্ছা হল।

তোমাদের কাছে চুপি চুপি বলি আমার বয়স হয়েছে ঠিক—কিন্তু তোমাদের মত ছেলেমানুষী অভ্যাস এখনও কিছু কিছু আছে। খুব আনন্দ হলে এক চোট নেচে নিতে ইচ্ছা করে। আশপাশে কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে দু চক্কর নেচে নিলাম। তারপর আবার বিজ্ঞাপনটা পড়লাম। ছোট্ট বিজ্ঞাপন।

ব্যবসায়, বিজ্ঞান গণিত সংক্রান্ত সমস্যা যত কঠিনই হোক নির্ভুল উত্তর পাবেন। গ্রাহকের সন্তুষ্টি নিশ্চিত। অনুসন্ধান করুন।

মিঃ কগনেট।

সুলতান হোসেনের মসজিদের পশ্চিমে।

এরকম বিজ্ঞাপন যখন দিয়েছে তখন নিশ্চয়ই ভদ্রলোক কম্পিউটারের সাহায্যেই উত্তর দিচ্ছেন। আমার পক্ষে সব ব্যাপারটাই তাহলে সহজ হয়ে যাবে। অঙ্কগুলো গুছিয়ে নিয়ে একদিন চললাম মিঃ কগনেটের অফিসে। এই কাহিনীর প্রথমেই যে পুরানো শহরে হাঁটবার কথা বলেছি সেটা এই দিকেরই ব্যাপার। শহরে এতদিন আছি মোটামুটি চেনাই আছে সব। বাব আল নসর জেবের তোরণ পেরিয়ে সেই মধ্যযুগীয় শহরের মধ্যে দিয়ে হাঁটিতে গিয়ে মনে হতে লাগল—ভদ্রলোক এত বড় একটা ব্যবসায় ফেঁদেছে। কিন্তু এই শহরের এই পুরাতন অংশে কেন? এখানে আসবে কে। নিজে নিজেই হাসলাম—আসবে বৈকি—যার গরজ সেই আসবে—যেমন আমি চলেছি।

শেষ পর্যন্ত একে ওকে জিজ্ঞাসা করতে করতে উপস্থিত হলাম একটা ঘরের সামনে। বাইরে একটা সাইন বোর্ড—ছোট এবং মোটেই চোখকে কেড়ে নেয় না। আরবী এবং ইংরাজী ভাষায় লেখা মিঃ কগনেট—গণিত, বিজ্ঞান এবং ব্যবসায় সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করে।

তাহলে এইটাই হল কগনেটের অফিস। কিন্তু অফিসের চেহারা দেখে মিশরী জ্যোতিষীদের অফিস ছাড়া কিছুই মনে হল না। তবে কি লোকটা জ্যোতিষী নাকি।

যাক এসেছি যখন দেখাই যাক। এগিয়ে গিয়ে দরজায় বেল টিপলাম। আরবী ভাষায় মেয়েলি গলায় উত্তর এল ভেতরে আসুন। ভিতরে গিয়ে দেখলাম ঘরখানা ছোট হলেও বেশ ছিমছাম। আধুনিক কায়দায় সাজানো। মিশরী জ্যোতিষীদের মত তসবী—পাঞ্জা—

অনেক রকমের দুর্বোধ্য নক্‌সা কিছুই নেই। নিঃশ্বাস ফেলা গেল তাহলে জ্যোতিষী নয়।

একজন মহিলা বসেছিল টেবিলে। দেখে ইরানী মনে হল—খুব ফরসা সুন্দর কালো চোখ কালো চুল। পোষাক কিন্তু পুরো পশ্চিমী। খুব গম্ভীর মুখে ইংরাজীতে বলল—আপনার কি দরকার।

আমি আমতা আমতা করে বললাম আমি মিঃ কগনেটকে চাই।

তার দেখা পাওয়া সম্ভব নয়—মহিলা কেমন ভাবলেশহীন মুখে বলল।—আপনার যা দরকার আমার কাছে দিন আমি তাঁর কাছে পৌঁছে দেব।

আমার অঙ্কগুলো বের করে বললাম—এই অঙ্কগুলোর উত্তর মন্তব্য এবং এর পরের সমস্যা কি হবে তাই জানতে চাই। কিন্তু কম্‌পিউটার ছাড়া কি এসব হবে।

মহিলা অল্প হেসে বলল—উত্তর পাবেন। আপনার অঙ্ক দেখছি তিনটি। তিনটির জন্য দেড়শ ডলার লাগবে। আমরা আমেরিকান ডলারে টাকা নিই। নগদ দিতে হবে। অর্দ্ধেক আজ দিয়ে যাবেন। পরশুদিন সকাল নটায় আপনার দেওয়া ঠিকানায় লোক মারফৎ উত্তর পৌঁছে যাবে। তার হাতে বাকীটা দিয়ে দেবেন। পচাত্তর ডলার এখন দিতে পারবেন ?

হাঁ পারব—পকেট থেকে মনিব্যাগ বের করে নোট গুনে দিলাম।

আপনার নাম ঠিকানা—

কার্ড বের করে দিলাম। মহিলা পড়ল কোনও মন্তব্য করল না।

টাকার রসিদটা আমার হাতে দিল। কার্ড রেখেদিল। বসেই আছি দেখে জিজ্ঞাসা করল আর কিছু দরকার আছে ?

হাঁ আছে—মিঃ কগনেট কোথায় থাকেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা আছে। বলে মহিলার মুখের দিকে চাইলাম। তেমনি ভাবলেশহীন মুখে সে বলল—এর উত্তরটা আপনি পরশু পাবেন। যে আপনার কাছে উত্তর নিয়ে যাবে সেই জানাবে মিঃ কগনেট আপনার সঙ্গে দেখা করবেন কিনা।

আমি আরও কিছু জানতে চাই—তাই আলাপ জমাবার চেষ্টা করলাম। বললাম আপনার নাম কি ?

আপাততঃ বলা চলবে না--মিঃ কগনেট যদি অনুমতি দেন তখন বলব। আপনি দেখছি খুব বাধ্য কর্মচারী—মনিবের অনুমতি ছাড়া কিছুই করেন না—আচ্ছা আজ উঠলাম। পরে দেখা হবে। বাসায় ফিরে এলাম।

* * *

দুদিন পরে। ঠিক নটার সময় দরজায় বেল টিপল কেউ। খুলে দেখি একজন মহিলা একখানা পুরু সীল করা খাম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কিছু বলবার আগেই বলল—আপনিই ডাঃ বাগচী। মিঃ কগনেটের কাছে থেকে আপনার উত্তর নিয়ে এসেছি। বাকী পচাত্তর ডলার দিয়ে এটা নিন।

খামটা হাতে নিয়ে দেখলাম বেশ ভারী। বললাম ঘরে এসে বসুন—না অনুমতি নেই—আমি এখানেই দাঁড়াচ্ছি—আপনি টাকাটা দিলেই আমি চলে যাব। অদ্ভুত ব্যাপার ত। এরা কি ক্রীতদাস। কথায় কথায় বলে অনুমতি নেই।

বললাম সকাল বেলা এসেছেন একটু কফি খান। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল—বলল না—না ওসব করতে হবে না।

আমি ঘরে এসে খামটার সীল ভেঙ্গে দেখলাম ফাঁকিবাজী কিনা—তারপর পঁচাত্তর ডলার নিয়ে এসে ওকে দিলাম। ও বিদায় নিয়ে চলে যেতেই আবার ডাকলাম। বললাম—আমি যে মিঃ কগনেটের সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম সে বিষয়ে কি উনি কিছু বলেছেন।

হ্যাঁ উনি বলেছেন কিছুদিন কাজকর্ম চলুক তারপর দেখা হবে।

এদিকে খাম খুলে দেখে আমি তাজ্জব। ষোল পৃষ্ঠা জুড়ে তিনটে অঙ্কের উত্তর। সব হাতেলেখা। টাইপ করা নয়। খুব ছোট ছোট করে লেখা মনে হয় কেউ খুব তাড়াতাড়ি করে লিখেছে। তিনটে অঙ্কের উত্তর তিনজনের হাতে লেখায় করা। সেদিন কলেজ ছুটি ছিল। আমি সারা দিন ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উত্তরগুলো পড়লাম। কি অদ্ভুত

সমাধান। যা আশা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক উঁচুদরের উত্তর। আমার চিন্তার মোড়ই ঘুরিয়ে দিয়েছে উত্তরগুলো। কিন্তু ব্যাপার কি ? দুইদিনের মধ্যে এ ধরনের অঙ্কের এমন উঁচুদরের উত্তর লেখা কি করে সম্ভব হল। কম্পিউটার ত নয় উত্তর লিখেছে মানুষ। তাহলে কগনেট আর তার দুজন সহকারী কি এত অসাধারণ বুদ্ধিমান। এতবড় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু এত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও ওরা কায়রোতে বসে আছে কেন ? পৃথিবীর যে কোনও উন্নত দেশে উন্নত ধরনের বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে এরা খুব বড় আসন নিয়ে থাকতে পারত।

মিঃ কগনেটকে দেখবার আগ্রহ আমার আরও বেড়ে গেল।

* * *

যে উত্তরগুলো পেয়েছিলাম তাকে সূত্র করে আরও অনেক দূর এগিয়ে গেলাম—তার ফলে মাস দুই পরে আবার এক জায়গায় এসে ঠেকে গেলাম। আবার কগনেটের সাহায্য দরকার। এবার ত আর দোনোমোনো করবার প্রয়োজন নেই। সোজাসুজি কগনেটের অফিসে গিয়ে হাজির হলাম।

সেই মহিলাই অফিসে ছিল। ধন্যবাদ জানালাম তাকে। বললাম এত তাড়াতাড়ি এই অঙ্কের উত্তর যে কেউ দিতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। মিঃ কগনেট অসাধ্যসাধন করেছেন। আরও দুটো অঙ্ক এনেছি।

মহিলা কাগজপত্র একটু দেখল বলল—এগুলো আরও কঠিন মনে হচ্ছে। এ দুটোর জন্য দুশ ডলার লাগবে।

তা দেব—কিন্তু মিঃ কগনেটের সঙ্গে দেখা করবার খুব আগ্রহ বেড়ে গেছে—সে ব্যবস্থা করবেন কি ?

এবার যখন উত্তর যাবে তখন তাঁর অনুমতি বা নিষেধ যাবে—মহিলা উত্তর দিল।

আমি বললাম—কিন্তু একটা কথা বলি—এসব উত্তর কে লেখেন। কোন কমপিউটার যে নয় তাত বুঝতে পারছি। কিন্তু মানুষের কি এমন ক্ষমতা হতে পারে। মহিলা কথা না বাড়িয়ে শুধু বলল—মিঃ কগনেট অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী।

আমি আর একটু আলাপ জমাবার উদ্দেশ্যেই বললাম—দেখুন ভারতীয় কোন শাস্ত্র মতে যোগ-প্রাণায়াম ধ্যান ধারণা করলে অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যায়। আমার সে অভ্যাস আছে খুব সামান্য যদিও। এর ফলে মন খুব নিবিষ্ট হয়ে যায় আর অনেক প্রশ্নের উত্তরও হয়ে যায়। তবে মিঃ কগনেট কি খুব বড় রকমের যোগী।

মহিলা যেন মনে হল আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে—সংক্ষেপে বলল —না তিনি বিজ্ঞানী। যাক সে কথা—যদি তিনি অনুমতি দেন তবে তাঁর কাছেই সব শুনবেন। আচ্ছা বিদায়—। এর উত্তর পেতে তিনদিন লাগবে।

একশ ডলার দিয়ে রসিদ নিয়ে বাসায় এলাম। যোগের প্রক্রিয়াতে মন খুব স্থির হয়। আর মন স্থির হলে অনেক কাজ এত তাড়াতাড়ি আর নির্ভুল ভাবে হয় যে ধারণার বাইরে। আমার যোগ প্রাণায়াম খুব অভ্যাস আছে কাজেও লাগে খুব। কিন্তু কগনেটের এই অদ্ভুত ক্ষমতা আমার ধারণারও বাইরে। প্রতিজ্ঞা করলাম ওর সাথে দেখা করতেই হবে।

তৃতীয় দিন ঠিক বেলা নয়টায় সেই মেয়েটি এল। এবার কৌশল করে টাকা দেবার অছিলায় ওকে দেরী করিয়ে দিয়ে ঘরে বসালাম। একটু পরেই আমার বাবুর্চি দু পেয়ালা কফি আর খুব সুস্বাদু মিশরী খাবার নিয়ে এল।

আমি বললাম—মিস—আপনার নাম ত জানি না একটু কফি খান। নানা—এসব আবার কেন? তাছাড়া আমার অনুমতি নেই।

একজন ভদ্রলোক এক কাপ কফি খেতে অনুরোধ করছে তারজন্য ও অনুমতি লাগবে। এ এক আশ্চর্য্য কথা। মেয়েটি ইতস্তত করে খেতে আরম্ভ করল।

মেয়েটির মুখ যেন কেমন ফ্যাকাশে রক্তশূন্য মনে হয়। আমি বললাম আপনার নামটি জানলে ভাল হয়—এর পরেও ত অনেক বার আসতে হবে।—নাম বলতে পারব না। আপনার ইচ্ছামত যা হয় বলে ডাকবেন।

ওর ঐ ফ্যাকাসে রং দেখে আমার কেমন মুক্তার কথা মনে হল।

আমি বললাম আমি ভারতীয়—আপনাকে একটা ভারতীয় নাম দিলাম মুক্তা।

আরও বিবর্ণ হয়ে মেয়েটি বলল—আমি এবার উঠব। এইসব কথা বলছে আর বার বার বাইরের দিকে তাকাচ্ছে দেখলাম।

সবটাই কেমন রহস্য মাখা—অফিসের মেয়েটিও বেশী কথা বলতে চায় না—এও তাই। আবার বাইরে তাকাচ্ছে—কেউ কি গোয়েন্দাগিরি করছে নাকি। ওকে বললাম আচ্ছা বিদায়—কিন্তু মিঃ কগনেট কি আমাকে যেতে বলেছেন।

কিছুই বলেননি—শুধু ঠিকানা দিয়েছেন। বলে একখানা কাগজ বের করে দিল। আমি ওকে দু ডলার বকশিস হিসাবে দিতে গেলাম। নানা ও নিতে পারি না—অনুমতি নেই মাপ করবেন। বলে বিবর্ণ



মুখে খুব তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে রাস্তায় পা বাড়াল, আমি সেদিকে চেয়ে রইলাম। হঠাৎ একটু দূরে গিয়েই থামল—এদিক ওদিক দেখল আবার খুব জোর পায়ে ফিরে এল।

সামনে দাঁড়িয়ে বলল—একটু ঘরের ভিতরে চলুন। ঘরের ভিতরে এসে বলল, মিঃ কগনেটের ঠিকানা পেয়েছেন কিন্তু আমার মনে হয় না গেলেই ভাল করবেন।

এইবলে আর কোনও দিকে না চেয়ে জোর পায়ে চলে গেল।

ও চলে গেলে আমি সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। ব্যাপারটা কি হল। দেখা যাচ্ছে—মুক্তা কগনেটকে রীতিমত ভয় করে। ওর ধারণা ওর পিছনে গোয়েন্দা ঘোরে অথবা যে ভাবেই হোক ওকে লক্ষ্য রাখছে কেউ। কেমন ছনমনে ভাব সব কাজে এবং কথায়। আমাকে কগনেটের সঙ্গে দেখা করতে নিষেধ করল কেন।

মানুষের স্বভাবই হল--যা নিষেধ করা যায় তার দিকে মনটা ঝুকে পড়ে। দুদিন ধরে অনেক বিচার বিবেচনা করলাম। একবার ভাবি যাই আর একবার ভাবি মুক্তা নিষেধ করল কেন? শেষ পর্যন্ত কৌতূহলই জয়ী হল। ভাবলাম দেখেই আসি। সেরকম বুঝলে ফিরে আশা যাবে।

* * * *

দিনটা ছিল রবিবার। সকাল বেলা সাজগোজ করে ঠিকানা লেখা কাগজটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে রিভলভারটা নিতে ভুল হলনা। মুক্তার কথাটা আমাকে বিচলিত করেছিল—না গেলেই ভাল হত? কেন? আর একটা ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছি যে যোগ বা ধ্যানের অভ্যাসের ফলে আসন্ন বিপদ, বা দিন বদলের আভাস মনে আসত। এবারও পেয়েছি সে রকম একটা আবছা আভাস। কাজেই যতটা সম্ভব সাবধান হয়েই রওনা দিলাম।

ঠিকানা ধরে এগোতে এগোতে ক্রমেই মধ্য যুগীয় সেই শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পড়লাম। বার আল্ নাসের (জয়ের তোরণ) পার হয়ে আরও পশ্চিমে আবাদিন প্রাসাদ ছেড়ে চলেছি। মাঝে

মাঝে কাউকে জিজ্ঞাসা করছি। কেউই বিশেষ কিছু খোঁজ দিতে পারছে না। শেষ মেশ একজন বলল আপনি কি পাগলা গারদের কথা বলছেন। তবে ঐ দিকটায় গিয়ে দেখুন।

আমি বললাম-এই ঠিকানা কি পাগলা গারদের ? লোকটা বলল—তাত জানি না-ওদিকটায় একটা খুব পুরোনো কেল্লার মত ইয়া বড় এক বাড়ী আছে। ওর ভেতর থেকে মাঝে মাঝে কারা যেন পাগলের মত চেঁচায়। হঠাৎ কখনও কখনও দু একজন পাগলা পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে—পালায় কিনা কে জানে। তাই এদিককার সবাই বলে ওটা একটা পাগলা গারদ।

আমার মনটা কেমন সন্দেহের ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। এতবড় একটা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান—তা কিনা এমন একটা অগম্য জায়গায় করেছে—আর এমন বাড়ীর মধ্যে করেছে যাতে নাকি পাগলরা বাস করে। ফিরে যাব নাকি ? আবার ভাবলাম দেখিই না কি ব্যাপার। আমায় ত আর কেউ খেয়ে ফেলবে না।

শেষ পর্যন্ত ঠিকানা মিলল। একটা অত্যন্ত পুরাতন বাড়ী—ইয়া পুরু নোনা ধরা দেয়াল ফটক বলতে কিছু নেই। হঠাৎ যেন দেয়াল ফুটো করে মাঝারি সাইজের একটা দরজা বসান হয়েছে। বাইরে একটা কাঠের বোর্ডে লেখা গাণিতিক সমাধান। তিন চারটে ভাষায় লেখা আছে। ব্যস আর কিছু লেখা নেই।

কলিং বেলের বোতাম টিপলাম। একটু পরে একজন মহিলা এসে দরজা খুলল। বলল—আপনার কি কাজে লাগতে পারি ?

বললাম মিঃ কগনেটের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

মহিলা বলল—আপনার পরিচয় ?

আমার নামের কার্ড এগিয়ে দিলাম। —ও আমাকে প্রায় অন্ধকার একটা কুঠুরীতে বসিয়ে রেখে চলে গেল। ও চলে যাওয়া মাত্র কুঠুরীর আসার এবং যাওয়ার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে বন্ধ হয়ে বসে বসে কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। ভাবলাম এই প্রতিষ্ঠানের তিনজন কর্মচারী দেখলাম সবাই মহিলা—এখানে পুরুষ

নেই নাকি ? অনেকক্ষণ বসে আছি আর কারও দেখা নেই। বিরক্তি বোধ হতে লাগল। দুত্তোর চলে যাই—উঠে দরজা খুলতে গেলাম—খুলল না। বুকটার ভিতরে ছাঁৎ করে উঠল। কি রহস্যময় জায়গায় এলামরে বাবা। পকেটে হাত দিয়ে রিভলভারটা ছুঁয়ে নিলাম।

হঠাৎ একটা আলমারীর পিছন থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। ওখানে যে দরজা আছে তা বুঝতেই পারিনি। লোকটার হাতে একটা ট্রে। তাতে গরম কফির পাত্র—রোলক্রীম—আর এক প্যাকেট সিগারেট। আমার সিগারেট খাবার নেশা নেই তবে মাঝে মাঝে টানি মাত্র। তাও বিশেষ ধরনের মিশরী সুগন্ধী সিগারেট। যা অভ্যস্ত ধূমপায়ীরা কোনদিন খায় না। আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম ঠিক সেই মার্কা সিগারেটই দেওয়া হয়েছে। লোকটা আরবী ভাষায় বলল—একটু দেরী হবে—ততক্ষণ এগুলো খান। লোকটা চলে গেল। আমি রোল ক্রীম শেষ করে কফি ঢেলে খেতে সুরু করলাম। তারপর সিগারেট টানতে লাগলাম। দুটো সিগারেট শেষ হয়ে গেল—কারো দেখা নেই। খুব রাগ হতে লাগল। এমন সময় ফিটফাট চেহারার একজন ঘরে ঢুকল। ইংরাজীতে বলল—সুপ্রভাত ডাঃ বাগচী—নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত বোধ হচ্ছে।

—বেশ কড়া সুরেই বললাম—সুপ্রভাত—কিন্তু বিরক্তিই ত স্বাভাবিক নয় কি ?

আমি দুঃখিত—মিঃ হেরম্যান জোহান একটু পরেই আপনার সাথে দেখা করবেন।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—সেকি—আমি মানে মিঃ কগনেট—তাহলে আমি ভুল জায়গায় এসেছি—

ভদ্রলোক একটু হেসে বলল—না ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। হেরম্যান জোহানই মিঃ কগনেট। আচ্ছা আর একটু বসুন। ঐ দরজাটার মাথায় লাল আলো জ্বলে উঠলেই ঐ হাতলটায় ধাক্কা দেবেন—তাহলেই মিঃ জোহানের ঘরে চলে যেতে পারবেন।

ভদ্রলোক ঐ দরজা দিয়েই চলে গেল।

আমি ভাবলাম ও মিঃ কগনেট তাহলে ছদ্মনাম। ইংরেজী গ্রামার থেকে বেশ নামটা নেওয়া হয়েছেত। লোকটা ত জার্মান, নামেই পরিচয়। একটু পরেই দরজার মাথায় লাল আলো জ্বলে উঠল। আমি গিয়ে হাতলে ধাক্কা দিলাম দরজা খুলে গেল।, ঘরে পা দিতেই মেঝেতে পাতা কার্পেটটা কেমন হড়কে গেল আমি কাত হয়ে মেঝেতে পড়ে গেলাম। একটা লোক তাড়াতাড়ি আমায় ধরে তুলল। উঠে দেখলাম



একটা কাচের টপ লাগান সুন্দর টেবিলের এধারে রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে একজন ছিমছাম পোশাক পরা রোগা মানুষ। চোয়াল বসা—চোখ দুটো যেন কোটরে ঢুকছে—কিন্তু অস্বাভাবিক

জ্বলজ্বল করছে। সমস্ত ঘরটা কেমন বিশ্রী হলদে আলোতে আলোকিত।

লোকটা বলল—হঠাৎ পড়ে গেলেন—ব্যথা লাগেনিত ?

আমি বললাম—না তেমন লাগেনি।

লোকটা বলল—বসুন ঐ চেয়ারটায়।

ওর মুখোমুখি বসলাম।

লোকটা বলল—ডাঃ বাগচী আমি জানতাম যে আপনি আসবেন।

—কিন্তু মিঃ কগনেট—

লোকটা আমায় থামিয়ে দিলে বলল—না আমি হেরম্যান জোহান। ব্যবসায়ের জন্য ঐ ছদ্মনামটা ব্যবহার করি। আপনার সঙ্গে এখন ব্যবসায়ের সম্পর্ক নেই—কাজেই।—যাক সে কথা—আপনি নিশ্চয়ই আপনার অঙ্কগুলোর নির্ভুল উত্তর পেয়েছেন।

এতক্ষণে আমিও অনেকটা সহজ হয়ে গেছি—মনের ভয়ও কমে গেছে।

বললাম—চমৎকার উত্তর। শুধু নির্ভুল বললে কম করে বলা হয়। আমার গবেষণা এর পরে কোন রাস্তায় নিয়ে যাব তারও সন্ধান দিয়েছে এই উত্তর।

—ধন্যবাদ আমি যে আপনার কাজে লেগেছি এতেই আমার আনন্দ।

—কিন্তু হের—( জার্মান ভাষায় মিঃ না বলে হের বলা হয় ) এগুলি আপনি নিজেই করেন নিশ্চয়ই।

—না না—তাকি সম্ভব—এরজন্যে আলাদা বন্দোবস্ত আছে।

—কোনও কম্পিউটার ?

—না কোনও কম্পিউটার নয়—মানুষই এসব করে। তবে যারা এইসব উত্তর লেখে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী কম্পিউটারের চাইতেও পাঁচশগুণ শক্তিশালী। আমি বিস্ময়ে বলে উঠলাম আশ্চর্য্য ব্যাপার ?—তাদের দেখতে পারি ?

—নিশ্চয়ই পারেন—তবে এখনই নয়। আপনাকে তিনদিন অপেক্ষা করতে হবে।

আচ্ছা আজ তাহলে আমি যাই। যেদিন আসতে বলবেন সেদিনই আসব। তার দরকার কি এখানেই থাকুন। আমার সবটা কারখানা দেখতে দিন দশেক লাগবে। সব দেখেশুনে নূতন অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ী ফিরবেন। হেরম্যান কেমন শয়তানের মত হেসে হেসে কথাগুলো বলল।

আমি বললাম—না তা কি করে হবে? আমার বাসার কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি—কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানান হয়নি—এসব করে তবে আবার আসতে হবে। আর থাকবারই বা কি দরকার আছে।

বেশ কঠোর স্বরে জোহান বলল দরকার আছে এবং থাকতে হবে।

আমি বেশ ঝাঁঝালো স্বরে বললাম—তার মানে? আপনার কথা মেনেই আমাকে চলতে হবে নাকি?

আপাততঃ তাই করতে হবে। হেরম্যানের চোখ দুটো যে জ্বল জ্বল করে উঠল।

আমিও চটে উঠলাম। আপনি আমাকে জোর করে আটকাতে চান নাকি?

—না জোর করে আটকাব কেন—অনুরোধ করেই আটকাব। বেশ কপট বিনয় মাখা স্বরে হেরম্যান উত্তর দিল।

থাক আমি উঠলাম—আপনার বিদ্রূপ সহ্য করবার মত ধৈর্য্যও নাই সময়ও নাই। উঠে দরজার দিকে চললাম।

জোহান হেসে উঠল—বলল—সব দরজায় ইলেকট্রিক তালা লাগান। সংকেত না জানলে খোলা যায় না।

—সত্যি বলছি কথাটা মোটেই ঠাট্টা নয় খুব রাগ হল।

ঘুরে এসে বললাম—আমাকে বন্দী করেছেন নাকি?

জোহান তেমনই শয়তানী হাসি হেসে বলল-যদি তাই করে থাকি।

এ কি অন্যায় কথা। কিন্তু আমাকে এভাবে আটকে রেখে আপনার কি লাভ?

সে কথা পরে হবে। আগে আমার কাজগুলো দেখুন পরে আমার লাভ কি আপনার লাভ সে সব কথা হবে।

না-আমি থাকতে চাই না—বেশ কড়া স্বরেই বললাম। থাকতেই হবে। দাঁতে দাঁত ঘষে—জোহান টেবিলে ঘুষি দিল।

এসব আশঙ্কাতেই রিভলভারটা এনেছিলাম। বের করবার জন্য পকেটে হাত দিতেই—জোহান বেশ ঠাণ্ডা আওয়াজে বলল-ওটা সরান হয়েছে। নার্ভাস হয়ে পড়লাম-জিজ্ঞাসা করলাম কখন?

যখন আপনি পড়ে গিয়েছিলেন।

—ও তাহলে ঐ ফেলে দেওয়াটাও আপনারই কারসাজি।

নিশ্চয়ই—হেরম্যান মিটিমিটি হাসতে লাগল। আপনাকে যে লোকটা ধরে তুলল সেই ওটা সরিয়ে ফেলেছে। বুঝলেন ডাঃ বাগচী—জেনে রাখুন হেরম্যান জোহানের সব কাজ অঙ্কের ছকে ফেলে করা হয়—কোথায়ও এতটুকু ভুল হয় না এত বড় বড় অঙ্কের উত্তর যার কারখানায় হয় তার এইটুকু ভুল হবে একথা ভাবছেন কি করে?

হঠাৎ স্বর নামিয়ে মিষ্টি গলায় বলল—আচ্ছা আপনি এত বিচলিতই বা হচ্ছেন কেন। না হয় দশদিন আমার এখানে অতিথি হয়ে থাকলেনই। কোনও অযত্ন হবে না।

আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম—আপনিই বা আমাকে এভাবে আটকাচ্ছেন কেন?

—সবকথা কি আগেই বলা যায়-আস্তে আস্তে সব রহস্যের জট খুলে যাবে।

জোহান চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলতে লাগল। আমি হতাশ হয়ে চেয়ারে বসে পড়লাম। হ্যাঁ ঠিক এই ভাবেই লোকে আমার কাছে সব ছেড়ে দেয় আর কিছু দিন পরেই সুপারম্যানে পরিণত হয়।

ওর কথাগুলো যেন হাতুড়ীর ঘায়ের মত আমার মাথায় পড়তে লাগল।

একটা বোতাম টিপতেই সেই ফিটফাট পোষাকের প্রথম লোকটি দরজা খুলে চলে এল। হেরম্যান বলল—গ্রোভ তুমি ডাঃ বাগচীকে তারজন্য নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে যাও। তোমার উপরে সব ভার রইল। কোনও দিকে যেন কোনও অযত্ন না হয়। বিকেল বেলা—হের চেস

আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। তার কাছে আমার সব উপদেশ দেওয়া থাকবে। একটু হেসে আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু উৎসাহ দেবার স্বরে বলল—আরে মশাই দুশ্চিন্তা না করে কয়েকটা দিন না হয় বিশ্রামই নিন।

আমি রেগে বললাম—খুব ত উপদেশ দিচ্ছেন। এভাবে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে—কলেজ কর্তৃপক্ষ কি ভাববে—বাসার চাকর বাকররা কি করবে—হয়ত বা দেশে আমার নিরুদ্দেশের খবর দিয়ে দেবে। হো হো করে হেসে উঠল জোহান—বেশত দশদিন পরে গিয়ে অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে উপন্যাস লিখবেন। আপনার ত সে অভ্যাস আছে। কতকিই ত বানিয়ে বানিয়ে লেখেন এবার সত্যি ঘটনা লিখবেন। হ্যাঁ এবার উঠুন।

গ্রোভ আমার পিঠ ছুঁয়ে বলল—চলুন। কি আর করা যায়? নিরুপায় হয়ে ওর সঙ্গে চললাম। করিডোরের পর করিডোর পার হয়ে চলেছি—যেন গোলক ধাঁধা। কোথায়ও দিনের আলো নেই—এক একটা জায়গা এক এক রকম আবছা আলোয় ভরা। যেন রূপকথার দৈত্যের আস্তানা।

শেষমেশ একখানা ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে গ্রোভ বলল এই আপনার ঘর। দরকারের সব জিনিষই আছে। আপনি ভয় পাবেন না। হেরম্যান জোহান অসাধারণ বুদ্ধিমান আর খুবই দয়ালু। যথার্থ বিজ্ঞানীর কদর তিনি জানেন। আপনার প্রথম তিনটি অঙ্ক দেখেই বলেছিলেন এত দেখছি একটা খুব বড় মগজের মানুষ। এর সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। তারপর দেখুন আপনি নিজে থেকেই কেমন চলে এলেন।

আমি ব্যঙ্গ করে বললাম—যেমন করে মাকড়সার জালে মৌমাছি এসে পড়ে।

গ্রোভ বলল—সে আপনি যাই ভাবুন কিন্তু পরে এ ধারণা থাকবে না। —আচ্ছা এই ওয়ারড্রোবে আপনার জন্য পাজামা ড্রেসিং গাউন সবই আছে। আপনাকে ত এখন বাইরে যেতে হচ্ছে না। আপনার

কোট প্যাণ্ট টাই সব খুলে ওগুলো পরে বেশ আরাম করে বসুন। যে কোনও দরকারে এই বোতাম টিপবেন লোক আসবে। এই বলে গ্রোভ আমায় ওয়ারড্রোব—বাথরুম—লিখবার টেবিল কাগজ কলম সব দেখিয়ে দিয়ে বলল এই টেবিলের উপরে একখানা বই আছে হেরম্যান জোহানের লেখা। আচ্ছা আমি চললাম।

সে চলে গেল—সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমি দরজা খুলবার চেষ্টা করলাম—খুলল না বুঝলাম আমি বন্দী কিন্তু কেন। নিজেকেই বললাম দেখাই যাক না কি হয়।

পোষাক পরিচ্ছদ ছেড়ে ওয়ারড্রোবের ভিতরকার কয়েক রকম পাজামা ড্রেসিং গাউনের মধ্যে বাছাই করে পরে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করলাম।

ভাবলাম এত বিচলিত হচ্ছি কেন। ওরা নিশ্চয়ই আমাকে মেরে ফেলবে না। জোর করে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করে একটা স্থগন্ধি মিশরী সিগারেট ধরালাম তারপর জোহানের বইটা তুলে নিলাম।

বইটার নাম—মানুষই সব ক্ষমতার উৎস। তার নীচে লেখা আছে কি করে তাকে কাজে লাগান যায়। নিজের মনেই বললাম বাঃ চমৎকার নাম ত। উল্টে দেখি একই বইতে ইংরাজী জার্মান আর ফ্রেঞ্চ ভাষায় গোটা বিষয় বস্তু বলা হয়েছে। আমি ইংরাজী আর জার্মান দুটো ভাষাই জানি—তবে ইংরাজীটাই বেশী রপ্ত তাই ইংরাজী বয়ানই শুরু করলাম।

পড়তে পড়তে গভীরভাবে ডুবে গেলাম। অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম—মানুষের মগজ স্নায়ুকোষ, যাকে নিউরোণ বলা হয় এদের গঠন কাজ সম্বন্ধে কি আসাধারণ সূক্ষ্ম জ্ঞান। নূতন চিন্তা নূতন গবেষণা সবই নূতন। আমি চিকিৎসক ফিজিওলজি মোটামুটি পড়াই আছে—কিন্তু জোহান যেখানে পৌঁছেছে সেখানে কোনও ফিজিওলজিষ্টও পৌঁছান নি। অহংকারের মত শোনালেও অহংকার করছি না—পড়াশোনায় আমি খুবই মনোযোগী। মনের সব খানিই একটা বিষয়কে ছেড়ে দিয়ে আমি পড়াশোনা করি। সেজন্য কঠিন বিষয়ও আমার

কাছে বিরক্তিকর মনে হয় না। হেরম্যানের এই বই পড়তে পড়তে আমি একেবারে অন্য রাজ্যে উপস্থিত হয়েছি যেন।

হেরম্যান বলছে—মানুষের মগজ—একটা ব্রহ্মাণ্ডের মত। একটা কম্পিউটারে শত প্রশ্ন ধরতে পারে? কিন্তু মানুষের মগজে স্নায়ুকোষ আছে কয়েক কোটি। এত বড় একটা শক্তির ভাণ্ডার নিয়ে মানুষ ঘুমিয়েই আছে যেন। বেশীরভাগ মানুষই খাওয়া দাওয়া আর ঘর গেরস্থালির কাজ নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেয়। চাকুরি বাকুরি ফুর্তি করা এইসব হল বাইরের দিক। খুব বুদ্ধিমান লোকেরা কি করে? বড়জোর কিছু গবেষণা করে—বই লেখে যন্ত্রপাতি তৈরী করে। কেউবা গান করে নাটক করে বড় অভিনেতা হয়। কিন্তু চরমে কেউই উঠতে পারে না। তার কারণ তার নিজের ভিতরে কি পরিমাণ শক্তি লুকিয়ে আছে তা সে নিজেই জানে না।

হেরম্যান জোহানের পদ্ধতি হল সেই ঘুমোনো শক্তিকে জাগিয়ে তোলা। তাহলে সাধারণ ভাবে যাকে অসাধ্য বা কষ্টসাধ্য মনে করা হয় তা হয়ে যায় অতি সহজ।

গোটা বইতে এইসব বিষয় নানা দিক থেকে আলোচনা করা হয়েছে।

—খুব ভাল লাগছে মনে হচ্ছে।

প্রথমটা শুনতে পাইনি। একটা বিষয়ের মধ্যে একেবারে ডুবে ছিলাম।

আবার সেইখান থেকে গলার আওয়াজ ভেসে এল—

খুব ভাল লাগছে বইখানা—কি বলেন ডাঃ বাগচী। এবার চমক ভাঙ্গল—মুখ তুলে চেয়ে দেখলাম হেরম্যান সামনে দাঁড়িয়ে মুখে মৃদু হাসি।

ওকে দেখে আবার বর্ত্তমান পরিবেশ যেন সামনে এসে দাঁড়াল, কি অবস্থায় আছি সব মনে পড়ল। ও বলল—অসাধারণ মনোযোগী আপনি। সেইজন্যই আপনাকে আমার কাজ দেখাব বলে আটকেছি। যাক তাহলে বইখানা আপনার ভাল লেগেছে।

—নিশ্চয়ই—কিন্তু এসবই কি আপনার অনুমান ?

—তার মানে ?

আমি হেসে বললাম—প্রথমেত কেউ একটা থিসিস দাঁড় করায়। যেমন আমি মাধ্যাকর্ষণ নিয়ে একটা থিসিস দাঁড় করিয়েছি যার জন্য আপনার সাহায্য দরকার হয়েছে।

হেরম্যান খুব জোরের সঙ্গে বলল—প্রথমে ছিল অনুমান—এখন হয়েছে প্রত্যক্ষ। অনেক অনেক বৎসর ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে করতে সব হাতের মুঠোয় এসে গেছে। আপনার দেওয়া অঙ্কগুলোর উত্তর দেখে কি আপনি নিশ্চিত হননি ?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—এগুলো কি কোন মানুষ আপনার এই গবেষণার ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে করেছে ?

ঠিক তাই—কয়েকজন মানুষ আমার এই নিয়ম অনুসরণ করে এমন অসাধারণ হয়ে উঠেছে। আপনাকে সবই দেখাব—সব বুঝিয়ে দেব। আশাকরি প্রথমে আমার উপরে যতটা রাগ ছিল এখন তা নেই। যাক আপনার দুপুরের খাবার সময় হয়েছে।

এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি—চমকে উঠে ঘড়ির দিকে চাইলাম ঠিক বেলা একটা।

হেরম্যান—একটু হাসল—বলল ডাঃ বাগচী আপনার মত মনোযোগী আর অনেক বিষয় ভাববার মত বুদ্ধিওয়ালা চৌখস লোক আমার চাই। আমি আপনাকে নূতন জগতে নিয়ে যাব। অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হবেন আপনি। দেখবেন বিশ্বে যা কিছু জানবার আছে সবই আপনি জানেন। ডাক্তার হিসাবে এমন ক্ষমতা হবে রোগী দেখেই সব বুঝে ফেলবেন। আর বিজ্ঞানী হিসাবে হেন বিষয় নেই যা আপনি বুঝবেন না।

আমি বললাম—তা মন্দ কি ?

আমার সহজ উত্তর শুনে জোহান, বলল—মাপ করবেন বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। ঐ যে আপনার খাবার এসে গেছে।

সেই আগের লোকটাই খাবারের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

জোহান বলল—আপনি ভারতীয় তাই আপনার অভ্যস্ত খাদ্যই দেওয়া হয়েছে। আপনি খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করুন। ক্রমে সব দেখাব।

জোহান আস্তে আস্তে চলে গেল।

লোকটা টেবিলে সব খাবার সাজিয়ে দিল। দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করলাম—লোকটা বোবার মত চুপ করে রইল।

* * *

জোহানের কথায় অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে খাওয়া দাওয়া সারলাম। কাজও নেই কাজেই পুরোপুরি বিশ্রাম।…ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

একটু শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল।—দিনের আলো নেই, বেলা বুঝবারও উপায় নেই। ঘড়ি ছিল দেয়ালে দেখলাম চারটে বাজে।

নূতন জায়গা নূতন পরিবেশ—ঘুমের আমেজটা ভাঙ্গতে একটু সময় লাগল। চেয়ে দেখলাম—চেয়ারে একজন ভদ্রলোক বসে আছে। এও খুব রোগা তবে হেরম্যানের মত অমন চোয়াল ভাঙ্গা নয়।

আমাকে দেখে লোকটা হাসল—বলল শুভ বিকাল ডাঃ বাগচী। …আমি গোল্ডেনবুর্গ চেস। অতবড় নাম তাই সংক্ষেপে সবাই চেস বলেই ডাকে। আমিও অভিবাদন করলাম শুভ বিকাল হের চেস। আপনার কথাই বোধহয় সকালে হেরম্যান বলেছিলেন।

—হ্যাঁ আমিই এই বিরাট ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক দিকটা দেখাশোনা করি। আপনি চিন্তাই করতে পারবেন না এই হেরম্যান মানুষটা কি অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। ওঁকে মানুষ না বলে অতিমানুষ বলা উচিত। সেই কথাই বোঝাবার ভার উনি আমাকে দিয়েছেন। আসুন চা পান করতে করতে আমরা সেই আলোচনাই করি।

হের চেস যা আলোচনা করলেন তা খুব কঠিন ব্যাপার। তোমরা এত কঠিন ব্যাপার বুঝবে না। আমি খুব সহজ করে তোমাদের বুঝিয়ে বলছি—এতে ব্যাপারটাও জানা হবে আবার নুতন কিছু শিখতেও পারবে।

মানুষের মগজটা কোটি কোটি কোষে তৈরী। এই কোষগুলিকে বলা হয় নিউরোন।

হেরম্যান বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে মানুষের মনে যে ভাব ওঠে আবার মিলিয়ে গিয়ে অন্য ভাব হয়, সবই ঐ নিউরোনগুলোর মধ্যে তৈরী একরকমের কাঁপন জাগার ফলে হয়। মনে করুন যে একজন বেদনা বোধ করছে—সেই সময় তার নিউরোনের মধ্যে যে কাঁপন জাগে যখন ঐ মানুষই আরাম বোধ করে তখনকার কাঁপন আগের থেকে আলাদা।

হেরম্যান অনেক দিন ধরে গবেষণা করে ঐ কাঁপনের সংখ্যা বের করেছেন। তারপর তিনি চেষ্টা করেছেন যে রেডিও চুম্বক তরঙ্গের সাহায্যে মগজের নিউরোনে এ কাঁপন জাগান যায় কিনা। সমস্ত শরীরের স্নায়ুদের মূল কেন্দ্র কিন্তু ঐ মগজ। কাজেই ঐ রেডিও চুম্বক তরঙ্গ স্নায়ুর মধ্য দিয়েই মগজে পৌছাবে। তাহলে হয়ত মানুষটার আনন্দ পাবার কোনও কারণ নাই অথচ ঐ তরঙ্গের সাহায্যে তার আনন্দ জেগে উঠবে। বেদনা পাবার কোন কারণ নাই অথচ অসহ্য বেদনায় লোকটা চিৎকার করবে। ঘুমের কোন কারণ নাই অথচ লোকটিকে অঘোরে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া যাবে। এই তরঙ্গের নাম দিয়েছেন 'সেভোন'। আর আনন্দ বেদনা এইসব জাগান সেভোন গুলোর পিছনে ঐ রকম লেবেল দেওয়া হয়েছে। যেমন—সেভোন জে অর্থাৎ (Joy)—যে তরঙ্গ আনন্দ জাগায়। সেভোন পি (pain) অর্থাৎ যে বেদনা সৃষ্টি করে। সবচেয়ে বড় কাজ হল যারা বুদ্ধিমান লোক তাদের সেভোন দিয়ে এতদূর বুদ্ধি বাড়ান যায় যা কল্পনারও বাইরে। পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন অঙ্ক কঠিন সমস্যা সব একেবারে যোগ বিয়োগ করা বা বর্ণমালা পড়ার মত সহজ হয়ে যায় তার কাছে। সাধারণ মানুষকেও ঐ সেভোন তরঙ্গ দিলে সেও প্রায় আপনার মত অঙ্ক কষতে পারবে। আর আপনাদের মত লোককে ঐ তরঙ্গ দিলে আপনি অতিমানব পর্য্যায়ে উঠে যাবেন। আপনার ঐ কঠিন অঙ্কগুলো যারা কষে দিয়েছেন তারা আগের জীবনে সাধারণ

স্কুল মাষ্টার ছিল। দেখুন আপনার বুদ্ধি যেখানে এসে থেমে গেছে তাদের বুদ্ধি সে জায়গা পার হয়ে গেছে। এই সেভোনকে হেরম্যান নাম দিয়েছেন সেভোন এস, আই (S. I. ) অর্থাৎ সুপার ইনটেলেক্‌ট। এরও উপরে উঠলে (S. H.) অর্থাৎ সুপার হিউম্যান। এই পর্য্যায়ে সবাইকে ওঠান যায় না।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম সেভোন কথাটা কি ?

হের চেস্ বলল—ওহো···ওটা বলিনি। ওটা হল সেণ্ট্রাল এনকেফালিক ভাইব্রেসন অফ নিউরোন ( এনকেফালিক মানে খুলির ভিতরের মগজ )

আমি বললাম আচ্ছা কিভাবে এটা তৈরী হয়। চেস বলল—এর পুরো কথাটা বলতে পারব না তবে এটা হল—রেডিও চৌম্বক ক্ষেত্রের একরকমের তরঙ্গ। একটা নির্দিষ্ট জায়গাকে এই তরঙ্গ দিয়ে একেবারে ভর্তি করে দেওয়া হয়। ওই ক্ষেত্রের মধ্যে মানুষ দাঁড়ালে তার সমস্ত শরীরের চামড়ার নীচে যে স্নায়ু আছে তার মধ্য দিয়ে ঐ তরঙ্গ গিয়ে মগজে উপস্থিত হয়। এই হল সংক্ষেপে সেভোনের পরিচয়।

আপনাকে কাল এই সেভোনের কাজকর্ম দেখাব। আমি বললাম—এই তরঙ্গ ত সব মানুষের এক রকম হওয়া উচিত নয়। কারণ মানুষের মগজের যে কম্পন তাও ত একরকম নয়। চেস আনন্দে বলে উঠল এই দেখুন আপনি ঠিক ধরেছেন। এই জন্যই হেরম্যান আপনাকে চেয়েছিলেন। হ্যাঁ তফাৎ হবে বৈকি। কিন্তু মূল গোড়ার কথাটা প্রায় একই থাকে। মনে করুন সেভোন পি· ( বেদনা ) কারও হয় একশ পঞ্চাশটা তরঙ্গে কারও বা একশ ষাট। এই দশের বেশী তফাৎ হয় না। এ রকম সব সেভোনই গড়পড়তায় দশ থেকে বার পর্যন্ত তফাৎ হয়। আমরা অনেক মানুষের উপরে পরীক্ষা করে এই তালিকা তৈরী করেছি। কোন মানুষের কত সেভোনে কি হয় তা আগে পরীক্ষা করে নিতে হয়। আচ্ছা আজ বইখানা পড়ুন— কাল থেকে আপনাকে দেখাব সব।

হের চেস চলে গেল—আমি বইয়ে মন দিলাম।

*  *  *

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি প্রাতঃকৃত্যের সব সরঞ্জাম একেবারে হাতের কাছে তৈরী। মনে মনে বললাম একেবারে জামাই আদর। ব্যাপার কি? তৈরী হয়ে নিতেই হের চেস এসে হাজির। বলল চলুন এবার আমাদের কাজ কর্মের ফল কতটা হচ্ছে দেখুন।

একসঙ্গে চললাম। বাড়ীর ভিতরটা যেন গোলক ধাঁধা। বাহিরের আলো কোথাও আসছে না। কৃত্রিম আলো দিয়ে গোটা বাড়ীটাই আলোকিত। বাইরে থেকে কোনও যন্ত্রের সাহায্যে বাতাস টেনে আনছে আর বের করে দিচ্ছে কয়লার খনির মত। কেমন একটা গা ছদছম করা পরিবেশ।

হের চেসের সঙ্গে একটা হলঘরে এসে ঢুকলাম। দেখলাম সারি সারি চেয়ার পাতা—তাতে দশজন হাফপ্যাণ্ট আর গেঞ্জি পরা লোক বসে আছে। হের চেস বলল ভদ্রগণ আপনাদের ঘুম ভাল হয়েছিল।

সবাই একযোগে বলে উঠল খুব ভাল খুব ভাল।

—ব্যায়াম শেষ হয়েছে—

—হ্যাঁ সব শেষ।

—এবার আপনারা নিশ্চয়ই প্রাতরাশ খাবেন।

—নিশ্চয়ই—

—তবে টেবিলে চলুন।

হলের একপাশে একটা লম্বা টেবিল পাতা, তার উপরে সকলের খাবার আলাদা আলাদা করে সাজান রয়েছে! সবাই যার যার মত টেবিলের ধারে সাজান চেয়ারে বসল।

চেস বলল—ভদ্রগণ যারজন্য আপনারা এই সুখের জীবন ভোগ করছেন তার প্রতি আপনাদের মনের ভাব কি তা এই ভদ্রলোক শুনতে চান।

এমনই আশ্চর্য্য ব্যাপার, সব কয়জন একযোগে সুর করে জার্মান ভাষায় গেয়ে উঠল।

হেরম্যান জোহানের জয়—।
তিনি মানুষের সেবা করেন।
মানুষ যে অনেক ক্ষমতা রাখে
তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন।
আমরা নূতন জীবন লাভ করেছি
আমরা আজ সুখী—আমরা পুরো মানুষ।
যে মানুষ অনেক ক্ষমতা রাখে।

অবাক লাগল। যে এতগুলি বিদ্বান লোক কেমন হিপ্নোটাইজড্ লোকের মত হেরম্যানের জয়গান করছে। ভক্তজন যেমন মন্দিরে দেবতার স্তব পাঠ করে। তবে এরা কি সম্মোহিত। মনে খটকা লাগল।

ওরা খেতে আরম্ভ করল। একজন হঠাৎ বলল আমার একটু পোরিজ দরকার ছিল। অমনিই সবাই একযোগে বলে উঠল—সেকি, তোমার কি খিদে মেটেনি? খিদে মিটে গেলে লোভে পড়ে খাওয়া অন্যায়। আর খেও না—ওঠ। মজার ব্যাপার যে সবাই একসাথে কথাটা বলল—যেন নাটকের অভিনয় করছে।

আবার খটকা লাগল।

চেস আমার দিকে চেয়ে আমার ভাব লক্ষ্য করছিল। বলল—আপনি কি কিছু বলবেন। হ্যাঁ কেমন অদ্ভুত ব্যাপার দেখুন দেখি। সবাই যেন শেখান বুলি আওড়াচ্ছে এ কেমন ব্যাপার?

চেস বলল—না শেখান বুলি হবে কেন—ওঁদের বুদ্ধি এখন খুব উঁচু দরে উঠেছে। ওঁরা কেন শেখান বুলি আওড়াবে। আচ্ছা আপনার খটকা দূর করে দিচ্ছি।

চেস—তখন একজনকে সম্বোধন করে বলল—মিঃ সাবরী এই ভদ্রলোক হলেন ফিজিক্সের অধ্যাপক নাম ডাঃ বাগচী—। ইনি আপনাদের সঙ্গে কিছু আলাপ করতে চান। আমি থাকব না সেখানে। ইনি যা জিজ্ঞাসা করবেন উত্তর দেবেন।

ওরা বলল—আসুন।

ওদের পিছন পিছন আর একটি হলঘরে উপস্থিত হলাম।

সারি সারি খাট, হাসপাতালের মত। একটা করে চেয়ার আর একটা করে লকার—। তার ভিতরে ওদের টুকিটাকি জিনিষ আছে।

সবাই যার যার খাটে শুয়ে পড়ল। সাবরী তার খাটে বসল—আমাকে বলল আপনি চেয়ারটাতে বসুন। বলুন কি ভাষায় কথা বলব।

বললাম ইংরাজী অথবা আরবী।

লোকটা হেসে উঠল আচ্ছা আরবী ভাষাতেই বলা যাবে।—বলুন কি জানতে চান।

বললাম—আপনার বাড়ী কোথায়?

—ওটা জানার কি দরকার?

—বেশ তাহলে একাই আছেন এখানে?

—হ্যাঁ।

—আপনার ছেলে মেয়ে স্ত্রী এসব কোথায়?

—আমাকে অবাক করে দিয়ে সাবরী বলল—ওরা নরকে পচছে—কিন্তু আমি স্বর্গে বাস করছি। কাজেই কেউ কারও খবর রাখি না।

আমি বললাম—এখানে খুব সুখেই আছেন তাহলে?

নিশ্চয়ই—নূতন মানুষ হয়েছি আমি। স্কুল মাষ্টারি করতাম। কি জানতাম ঐ বিদ্যা নিয়ে আবার ছেলেদের শেখাতাম। হেরম্যানের কৃপায় এখন কি যে প্রচণ্ড জ্ঞান আমার তা বলে বোঝান যাবে না।

—বাড়ী যাবেন না—?

—কেন যাব সেই নরকে?

এই কথার মধ্যেই আর একজন উঠে এল।—বলল—আপনি কে? গায়ের রং দেখে বুঝছি—এশিয়াবাসী কি জন্যে এখানে এসেছেন?

—বললাম—হেরম্যান জোহান নিয়ে এসেছেন।

—বাপ্তাইজ করেছেন?

- আমি হবাক হয়ে বললাম—সে কিরকম?

—কেন বাপ্তাইজ বুঝলেন না? আপনাকে নূতন জীবন দেবার কাজ। সাপ খোলস ছাড়ে জানেন ত? নানা উপমাটা ঠিক হল না। আচ্ছা রেশম পোকা গুটির মধ্যে থেকে বেরোয় কখন জানেন ত?

বললাম—জানি—যখন ঠিক বয়স হয়ে সাবালক হয়—

—অর্থাৎ পরিণত হয়—কেমন? আপনি ঠিক ধরেছেন। হেরম্যান যখন চিনিয়ে দেবেন যে আপনি কত বড় মানুষ তখন বুঝবেন যে আপনার সামান্য জ্ঞান নিয়ে আপনি এতদিন গুটিপোকার মত ঐ গুটির ভিতরে আটকে ছিলেন। এবার পুরোপুরি মানুষ হলেন।

এই কথা হচ্ছে এর মধ্যে হঠাৎ আর একজন উঠে এল—বলল—কি বলছেন মশাই—এই নূতন ভদ্রলোককে। না না আপনি চলে যান আপনার আর নূতন জীবনে দরকার নাই। এখনও আমার মাঝে মাঝেই আমার বউ আর ছেলেটির কথা মনে পড়ে আর কান্না পায়।

—তবে বাড়ীতে যান না কেন?

—লোকটা বিষণ্ণ হয়ে বলল—যাব কি করে?—হেরম্যান আমাকে খোঁড়া করে রেখেছেন।

সাবরী চেঁচিয়ে উঠল—কি বলছ তুমি—তুমিত বেশ হেঁটে বেড়াচ্ছ।—তোমাকে খোঁড়া করল কি করে?

তখন আর সবাই এক সাথে লোকটাকে গাল দিতে লাগল। একটা হৈ চৈ বেধে গেল। হের চেস এগিয়ে এল—বলল—এটা কি হচ্ছে ভদ্রগণ?

—সাবরী বলল—ওয়েন আমাদের গডফাদারকে গাল দিচ্ছে।

চেস হেসে বলল—ওয়েন তুমি কি বলছিলে?

কিছু বলিনি—বলে ও যেন তার খাটে শুয়ে পড়ল।

আমার মনে খটকা লাগল আবার। তাইত ব্যাপারটা কি হতে পারে?

পিছনের দরজা খুলে গেল—হেরম্যান জোহান বেশ গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই দাঁড়িয়ে উঠে মাথা নীচু করে ওকে অভিবাদন করল—ওয়েলকাম গডফাদার। ওয়েনও উঠল।

জোহান সোজাসুজি ওয়েনের কাছে গিয়ে তার পিঠে হাত রেখে বলল—ওয়েন। তোমার খুব খারাপ লাগছে ?

—হ্যাঁ আমার স্ত্রী আর ছেলের কথা খুব মনে পড়ছে।

বেশত। আজই বাড়ী চলে যাও। তারপর চেসের দিকে চেয়ে বলল—ওয়েনকে আজই ওর বাড়ীতে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দাও। যাবার সময়ে অনেক করে টাকা দিয়ে দিও। ওর মাইনের দুগুণ। যাতে বাড়ী গিয়ে কিছুদিন ভাল ভাবে থাকতে পারে। ওয়েন এবার খুশী ত ? ওয়েন আবার নত হয়ে বলল—নিশ্চয়ই গডফাদার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি তাহলে কবে যাচ্ছি ?

—আজই—জোহান বেশ জোরের সঙ্গে বলল···তবে আজ যাবার আগে কিছু কাজ আছে সেরে দিয়ে যেতে হবে।

—নিশ্চয়ই, ওয়েন—আনন্দে গদ গদ হয়ে বলল।

হেরম্যান তখন চেসের দিকে তাকিয়ে বলল—আজকের কাজটা ওয়েন, সীম্যান, আর ফারলো—এই তিনজনে করে দেবে।

সবাই মাথা নীচু করে বলল—আপনার সব কথাই আমরা মাথা পেতে নিচ্ছি। হের চেস—আমাকে বলল—চলুন এবার—দু ঘণ্টা পরে ওদের কাজ দেখবেন।

* * *

দু ঘণ্টা পরে —।

একটা কাচের ঘর, বাইরে থেকে শব্দ যায় না বা ভিতরের শব্দও আসে না। মেঝেটা পোর্সোলিনের ( চীনা মাটীর ) তৈরী। মাথার উপরে অনেক যন্ত্রপাতি ঝুলছে। কিছু বৈদ্যুতিক কয়েলের মত—কিছু ট্রান্সমিটারের মত আরও অনেক রকমের যন্ত্র। তিনটে টেবিলের ধারে তিনটে চেয়ারে বসে আছে ওয়েন, সীম্যান আর ফারলো।—ওদের সামনে টাইপ করা কয়েকখানা কাগজ। আর দিস্তা দুয়েক করে সাদা কাগজ। টেবিলের উপরে গ্লাসে কিছু পানীয়। দু তিনটে কলম আছে টেবিলের উপরে। একটু নূতন ধরনের কলম। ওরা চুপ করে বসে

আছে। হঠাৎ ঘরে লাল পরে হলুদ আলো জ্বলে নিভে গেল। ওরা সবাই এক ঢোক করে গ্লাসের পানীয় খেল।

এবার চেসের আদেশে ইঞ্জিনিয়ার রুডলফ তিনটি হাতল টেনে দিল। তিনজনই যেন শক্ খেয়ে সোজা হয়ে বসল। তারপরে টাইপ করা কাগজ দেখতে লাগল। তিন চার মিনিট দেখা হতেই রুডলফ আবার অন্য হাতল টেনে দিল—।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা কলম তুলে নিয়ে কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে লিখতে সুরু করল। স্বচ্ছ কাচের দেয়াল দিয়ে সব দেখা যাচ্ছে। সর্বনাশ সে কি লেখার গতি—। খুব গতিসম্পন্ন টাইপিষ্টও অতগুলো শব্দ এত তাড়াতাড়ি টাইপ করতে পারবেনা। ভাবছে না—চিন্তা করছে না শুধু লিখে চলেছে। তিন চার মিনিটে এক একটি পৃষ্ঠা শেষ হয়ে যাচ্ছে।

জোহান বলল—দেখলেন ডাঃ বাগচী ওদের সবাইকে সেভন এস, এইচ ( সুপারহিউম্যান ) দেওয়া হয়েছে। কি সাংঘাতিক কঠিন অঙ্ক এক এক মিনিটে কষে ফেলছে দেখছেন।

দেখছিলাম আর ভাবছিলাম—আমার দেওয়া প্রশ্নের উত্তরও ত এমনই সাংঘাতিক গতিতে লেখা ছিল।

বললাম—এ যেন মহাকাশ গবেষণার চেয়েও বিস্ময়কর। আপনি অসাধারণ।

জোহান হেসে বলল—আপনার প্রশংসাই আমার পুরস্কার।

এক ঘণ্টা পরে রুডলফ সুইচ বন্ধ করল। . ওরা লেখা থামাল—। কলম রেখে গ্লাসের পানীয় চুমুক দিয়ে খালি করল। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। মিনিট পনের পরে আবার শুরু হল। আবার একঘণ্টা ধরে লেখা চলল।

রুডলফ সাবির আর ফারলোর লেখা শেষ সংকেত দিল। ওরা বেরিয়ে এল। কিন্তু ওয়েন তখনও লিখছেই।

সাবির আর ফারলো বেরিয়ে এল—মুখে চোখে ক্লান্তির কালি লেগেছে। ওদের দুজনকে একটা টেবিলে বসিয়ে কয়েক রকম খাবার দেওয়া হল। খেয়ে ওরা চলে গেল। একটা কথা কেউ বলল না। চলতে গিয়ে একটু টলছে মনে হল।

কিন্তু ওয়েন লিখেই চলেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম ওরা থামল ওয়েন থামল না কেন?

জোহান বলল—ওর অঙ্ক শেষ হয়নি। হঠাৎ কলম নামিয়ে রেখে ওয়েন কি ভাবতে লাগল। আমি চিকিৎসক আমার নজরে ওর মুখের চেহারা বদলানো সহজেই ধরা পড়ল। অস্বাভাবিক বিষন্ন আর ক্লান্ত। আমি বললাম হের জোহান ওয়েন অসুস্থ মনে হচ্ছে।



বলতে বলতেই ও ঝুঁকে সামনের টেবিলের উপরে পড়ে গেল। হাত দুখানা টেবিলের দুধারে ঝুলে পড়ল। রুডলফ সুইচ অফ করে দিল।

কাচের দরজা খুলে দু তিন জন মিলে ওকে বাইরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিল। আমি ওকে পরীক্ষা করতে যাচ্ছিলাম। জোহান বলল—ডাঃ বাগচী আপনি সরে দাঁড়ান আমাদের ডাঃ রাইফ এসে গেছেন।

লজ্জা পেয়ে সরে দাঁড়ালাম। ডাঃ রাইফ ওকে পরীক্ষা করল—ইনজেকশন দিল। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করতে বলল—এসব আপনার মাথা ঘামানোর ব্যাপার নয়।

আবার লজ্জা পেলাম। ওয়েনকে ট্রেচারে করে—আলাদা ভাবে তৈরী অসুস্থ লোকের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল।

* * * *

পরদিন দুপুরে।

হেরচেস আমার ঘরে এসে বসল। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলাম—ওয়েন কেমন আছে?

চেস হেসে বলল—ও ভাল হয়েছে। বিকেলেই বাড়ীতে চলে গিয়েছে।

—ওর বাড়ী কোথায়?

—স্কটল্যাণ্ডে ওকে হের জোহান প্রচুর টাকা পয়সা দিয়েছেন যাতে বাড়ী গিয়ে বাকী জীবনটা আর কাজ না করেই কাটাতে পারে।

আমি বললাম—আপনাদের কাজও ত কম করে দেয় নাই—অবশ্যই-চেস বেশ জোর দিয়ে বলল—হেরম্যান জোহান অত্যন্ত বিবেচক মানুষ। যার যা পাওনা তার উপরেই দিয়ে থাকেন। যাক সে কথা—আজ রাত্রে হেরম্যান জোহান আপনার সঙ্গে কিছু কাজের কথা বলবেন।

রাত্রে হেরম্যান জোহান আর চেস দুজনেই আমার ঘরে এল।

জোহান বলল—ডাঃ বাগচী দেখেছেন আমার আবিস্কার আর তার প্রয়োগ। মানুষের ভিতরের ঘুমিয়ে পড়া শক্তিকে আমি কিভাবে জাগিয়ে তুলেছি। এই দেখুন ওয়েন সাবির আর ফারলোর কষা সমাধান।

দেখলাম আর অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। আড়াই ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তিনটি মানুষ ছয় দিস্তা কাগজ লিখে শেষ করেছে। আর কি কঠিন সমাধান। তারিফ করবার মতই বটে।

হের চেস বলল—ডাঃ বাগচী আমাদের গডফাদারের ইচ্ছা আপনি আমাদের দলে আসুন। ওখানে আপনি যে বেতন পান তার আটগুণ বেতন আমরা দেব।

আমি মাথা ঠাণ্ডা রেখেই বললাম—আমাকে কি কাজ করতে হবে?

এবার জোহান কথা বলল—যা এখন করেন তাই করতে হবে। অর্থাৎ আমরা কিছু ছাত্র দেব তাদের অঙ্ক আর ফিজিক্স পড়াবেন।

—কি রকম ছাত্র আনবেন? প্রথম থেকে ওসব করাতে ত অনেক দিন লাগবে।

জোহান হেসে বলল—ডাঃ বাগচী এখনও আমার উপরে নির্ভর করতে পারছেন না। আমরা যে ছাত্র আনব তারা অঙ্ক আর ফিজিক্স কিছু কিছু জানে। আপনি তাদের আরও পাকা করে তুলবেন। আমার পদ্ধতি মত সেখানে দুমাসে তারা পাকা হয়ে যাবে। আমি যাচাই করবার জন্য বললাম—তাদের দিয়ে আপনি কি করবেন।

যা দেখলেন তাই করাব।—জোহান উত্তর দিল। তবে একটা লোক যদি সামান্য অঙ্ক জানে বা ফিজিক্স অল্প জানে তাদের সেভোন এস এইচ দিলেও ভাল সমাধান বেরোবে না। সেজন্য বেশ খানিকটা জ্ঞান থাকা দরকার।

—এরকম ছাত্র পাবেন কোথায়?

দেখুন আমার নিজের সংগ্রহে যারা ছিল কাজ করতে করতে বাড়ীর কথা মনে হলেই ত তাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে হয়—যেমন ওয়েন কাল চলে গেছে। এমনই করে প্রায় সব বিদ্বানই ফুরিয়ে গেল। অথচ এখন কাজ দিন দিনই বেড়ে চলেছে। গোটা পৃথিবী থেকে কাজ আসছে। এখন আরও লোকের দরকার।

জিজ্ঞাসা করলাম—লোক পাবেন কোথায়?

বিজ্ঞাপন দেব—জোহান শান্তস্বরে বলল—এশিয়ায় বেকার সমস্যা

খুব। কম্পিউটারের কাজ শিখিয়ে চাকুরী দেওয়া হবে বলে বিজ্ঞাপন দিলে অনেক শিক্ষিত লোক পাওয়া যাবে। কিছু লোককে ফিজিক্স আর অঙ্ক শেখান হবে। কিছু লোককে কেমিষ্ট্রি কাউকে রাষ্ট্রনীতি। সে সব ভার নেবার লোক আছে। আপনি খালি ফিজিক্স আর অঙ্ক শেখাবার ভার নেবেন। আমি হেসে বললাম—আপনার এই গোলক ধাঁধা থেকে ত ইচ্ছা করলেই বেরোতে পারব না। কাজেই আপনার কথাই শুনতে হবে—কিন্তু আমাকে ছেড়ে দেবেন কবে? জোহান ওর শয়তানী চোখে যতটা নরম হাসি মেশান যায় মিশিয়ে বলল—একশ জন মানুষ তৈরী করে দিলে আপনাকে ছুটি দেব। আর যাবার সময় এত টাকা দেব যা আপনার কল্পনারও বাইরে।

কিছুটা প্রলোভনে পড়লাম। আবার বন্দী দশার কথা ভেবে একটু পিছিয়ে এলাম। বললাম আর দুটো দিন ভাববার জন্য সময় দিন। চেস বলল—দেখুন ডাঃ বাগচী—হের জোহান যা বলছেন তাতে ত আপনার কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। কাজেই এটাতে রাজী হন। বিশেষ করে পালানো ত সম্ভব হচ্ছে না আপনার পক্ষে।

কথাটা সত্যি হলেও আমার কেমন রাগ হল। বললাম—পালাতে পারব না—তার মানে আমি আপনাদের হাতে বন্দী?

চেস নির্বিকার মুখে উত্তর দিল—সে আপনি যা ভাবেন।

কোনও ভাবেই আপনি এখান থেকে বেরুতে পারবেন না। যদি আমি ইচ্ছা করে বের করে না দিই। জোহানের চোখ দুটো যেন কথাগুলো বলবার সময় ধক্ ধক্ করে জ্বলছিল। ও বলে যেতে লাগল আপনি যতই বুদ্ধিমান হন না কেন—এ বাড়ীর প্রতিটি দরজা জানলা মেঝে ছিটকিনি সব আপনার চেয়েও বুদ্ধিমান। পালাতে চাইলেও ওরাই আপনাকে ধরিয়ে দেবে।

আমার রাগ হতেও চেপে গেলাম। মনে হল ছোটবেলায় হিতোপদেশে পড়েছি—সহসা বিদধ্বি ত ন ক্রিয়াম। হঠাৎ কোনও কাজ করে বসবে না। ভেবে চিন্তে করবে। তাই একটু চিন্তা করে বললাম আমাকে দিন তিনেক একটু ভাবতে দিন—আর এই

তিনদিন আপনার মানুষ কম্পিউটারগুলো কেমন কাজ করে দেখতে দেবেন।

বেশ তাই হবে—জোহান ঠাণ্ডা স্বরে বলল—কিন্তু আপনার রাজী হওয়া ছাড়া পথ নেই।

*   *   *   *

পরের পরের দিন—। সকালে চেস এল—সুপ্রভাত ডাঃ বাগচী—কিন্তু ব্যাপার কি বলুন ত। আপনি দিব্যি বেঁচে আছেন—আর এদিকে—এঁ্যা কি কাণ্ড। আমি কি ভুল দেখছি।

কায়রোর একমাত্র ইংরাজী কাগজ দি নাইল আমার সামনে মেলে দিয়ে মিট মিট করে হাসতে লাগল।

কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার ছবি ছাপা হয়েছে। উপরে লেখা আল ফুতে কলেজের ভারতীয় অধ্যাপক ডাঃ বাগচীর শোচনীয় মৃত্যু।

তারপরে ঘটনার বিবরণ দিয়েছে—বার আল নাসেরের উত্তর দিকে যে খালটা আছে তার পাড়ে জলের কোন ঘেঁসে একজন মরা মানুষ পড়ে আছে দেখে লোকজন পুলিশে খবর দেয়। তারা এসে লাশটা নিয়ে যায়। কিন্তু মৃতের মুখখানা এত ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল যে সনাক্ত করবার কোনও উপায় ছিল না। শেষ পর্যন্ত মৃতের পকেটের নোটবুক ডায়েরী এবং পোষাকে ধোপার চিহ্ন দেখে সনাক্ত করা হয় যে—ঐ লাশ ডাঃ বাগচীর। কলেজ কর্তৃপক্ষ এই মত সমর্থন করেন। দু একজন লোক সাক্ষী দেয় যে ঐদিন ডাঃ বাগচীকে ঐ সাঁকোর উপরে দেখা গিয়েছিল। একজন একথাও বলে যে একজন মাতাল কাফ্রীর সঙ্গে তাঁর বচশা হচ্ছিল। সম্ভবত ঐ মাতাল কাফ্রীই তাকে হত্যা করে নীচে ফেলে দিয়েছে। ভাল পড়ানো এবং মধুর ব্যবহারের জন্য ডাঃ বাগচী সবারই প্রিয় ছিলেন। সেজন্য সবাই শোকগ্রস্ত। তাঁর আত্মার শান্তির জন্য কলেজ সংলগ্ন মসজিদে মোনাজাত করা হবে। সব ছাত্রকে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পড়ে চললাম—ব্যাপারটা ত সহজ না একটা চক্রান্ত বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কে করল। চেস বলল—তা আমরা কি জানি। বলে হাসতে লাগল।

বললাম—সবই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে—কিন্তু কেন? চেস—কারণ আপনাকে আমাদের চাই। আপনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন—সবাই আপনার খোঁজ করছে। তাদের এই অনর্থক খোঁজা খুজির হাত থেকে রেহাই দেবার জন্যই এই পরিকল্পনা।

—কিন্তু আমার পোষাক-ডায়েরী, নোট বই-রুমাল—আমি কেমন আমতা আমতা করে বললাম—

—সব আপনার দেখলেই বুঝতে পারবেন—তাড়াতাড়ি পেষাকের আলমারী খুলে দেখলাম—আমার পোষাক নেই—আর তার পকেটে যা ছিল—তাও নেই। তার বদলে—নূতন কোট প্যান্ট সার্ট টাই সব মজুত।

চেস হেসে বলল—সব নতুন ঠিক আপনার গায়ের মাপে তৈরী—একেবারে নিখুঁত। ভারতবর্ষের লোকেরা নাকি সবাই ম্যাজিক জানে—মিশরেও ম্যাজিকের চলন খুব। এটা মিশরীয় ম্যাজিক বলে ধরে নিন।

রাগ হল—বললাম দেখুন হের—মানুষকে এইভাবে মুঠোর ভিতরে এনে এমন ঠাট্টা করা ইতরের লক্ষণ। আপনারা আমার মারবার খবর শুধু শুধুই প্রচার করলেন। আমার দেশের বাড়ীতে নিশ্চয়ই এই খবর যাবে। বুঝুন ত তাদের কি অবস্থা হবে।

আপনি প্রথম থেকে স্বীকার করলে আমাদের এতটা ব্যবস্থা করতে হত না। আপনাকে এতবড় সম্মানের পদটা দিতে চাওয়া হচ্ছে তবুও আপনি দোমনাই থাকছেন। অথচ আমরা যদি ইচ্ছা করি তাহলে আপনাকে সেভন রিভার্স দিয়ে একেবারে স্মৃতিশক্তি নষ্ট করে দিয়ে ছেড়ে দিতে পারি।

তা পারেন—আমি বিষণ্ণ হয়ে বললাম। এই কয়েক দিন দেখে আপনাদের এই নরকের ব্যাপারটা কিছু কিছু বুঝতে পারছি মনে হচ্ছে। অবশ্য সবটুকু বুঝছি না।

চেস বলল—এবার স্বীকার করে ফেলুন—দেখছেন ত আপনি মরে গেছেন। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করুন।

* * *

এরা চলে গেল আমাকে চিন্তায় ডুবিয়ে দিয়ে। সকাল থেকে দুপুর হল। দুপুর থেকে বিকেল, বিকেল থেকে সন্ধ্যা। কিন্তু সবই ত ঘড়ির কাঁটায়। গোটা হেঁয়ালী পুরীটা কি যেন আলো দিয়ে আলোকিত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় রং বদলায়। আর ঘড়ি দেখে বোঝা যায় যে এই দুপুর হল এই সন্ধ্যা হল। রাত্রের খাওয়া শেষ হল। কোনও ত্রুটি রাখেনি জোহান। ঠিক আমার পছন্দমত খাবারই আসে। ঠিক পরিমাণ, একটুও কম হয় না বা বেশী হয় না।

ভাবলাম যখন ফাঁদেই পড়েছি এখানে যখন মাষ্টারীই করতে হবে তখন জোহানের বইখানা আবার পড়ি।

অভ্যাসমত শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম। হঠাৎ দেখি আলমারীর পাশে যে বইএর সেল্ফ ছিল নড়ে উঠল। তারপরেই খুলে গেল। চেয়ে আছি সেদিকপানে কিছুটা ভয়ে কিছুটা বিস্ময়ে। একটা মুখ উঁকি মারল ওটার ফাঁক দিয়ে। তা মুক্তার মুখ। আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম মুক্তা বলে তার আগেই মুক্তা ঠোটে আঙ্গুল দিয়ে চুপ করবার ইসারা করল। মুক্তাকে দেখে আমার একটু আশার সঞ্চার হল। কাজেই ওর ইসারা মত চুপ করে রইলাম। পা টিপে টিপে ও ঘরে ঢুকল। তারপরে ওয়ারড্রোব খুলে কিছু একটা করল। এবার কথা বলল—শুভ রাত্রি ডাঃ বাগচী। আমি বললাম মুক্তা তুমি এসেছ আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু ওয়ারড্রোবে কি করলে।

টেপ রেকর্ডারের সুইচ বন্ধ করে দিলাম। মুক্তা ফিসফিস করে বলল—আপনি কিছু কথা বলেন কিনা শব্দ করেন কিনা সব বোঝবার জন্য রেকর্ড করবার ব্যবস্থা আছে। ওদের চোখ কান সব যান্ত্রিক। আমার উপরে এসব লক্ষ্য করবার ভার দেওয়া আছে। আপনার পাশের ঘরটাই আমার। গোপন দরজা দিয়ে আমাকে মাঝে মাঝে আপনাকে লক্ষ্য করবার নির্দেশ দেওয়া আছে।

আমি বিষণ্ণ স্বরে বললাম—মুক্তা তুমি বলেছিলে, না গেলেই ভাল হয়। তখন সে কথা শুনিনি এখন ফাঁদে পড়ে গেছি।

মুক্তা বলল—তা ঠিক কিন্তু আপনাকে দু একটা কথা বলবার জন্য বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এসেছি। আপনি বুদ্ধিমান লোক। আগে থেকে জানা থাকলে ফাঁদ কাটবার ব্যবস্থাও হয়ত করতে পারবেন। বললাম —এখান থেকে পালাবার উপায় বলতে পার। মুক্তা বলল—না—তা পারব না। তবে আগে সব কথা শুনুন। সবটা শুনে কিছু করতে পারবেন কিনা ঠিক করে নিতে পারবেন।

আমি বললাম—এই বাড়ীর রহস্য বলবে। মুক্তা বলল—এই বাড়ীর রহস্যেরও অনেক আগে থেকে এই কাহিনী শুরু। হেরম্যান জোহান এই সমস্ত কিছুর নায়ক এবং রূপকার। তার কাহিনীই আগে শুনুন।

* * *

**হেরম্যান জোহানের কাহিনী**

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাইন নদীর ধারে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বিরাট বন্দী শিবির। নাম ছিল বার্বারোস বন্দী শিবির। ইংরাজ ফরাসী বন্দী ত ছিলই—হিটলার সরকারের অবাধ্য জার্মানী বন্দীও ছিল কিছু। বিরাট বন্দী শিবির—কয়েক হাজার বন্দী ছিল। তারা নানা রকম পরিশ্রমের কাজ করত। এরই মধ্যে হেরম্যান জোহান—সরকারকে বলে তার পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবার জন্য ঐ শিবিরে ভারপ্রাপ্ত হয়ে এল। যুদ্ধের আগে ও ছিল ফিজিওলজি বা শারীরতত্ত্বের এবং স্নায়ু রোগের বিশেষজ্ঞ। দু তিনটি মেডিক্যেল কলেজে পড়াত আবার গবেষণাও করত।

ও সরকারকে জানাল যে ও এমন গবেষণা করছে যাতে দেশে কয়েক হাজার অতিমানব সৃষ্টি করতে পারবে। তারা না পারবে হেন কাজ নেই। জন্তু জানোয়ারের উপরের পরীক্ষা শেষ হয়েছে এবার

মানুষের উপরে পরীক্ষা করা দরকার। কিন্তু পরীক্ষার প্রথম দিকে অনেক মানুষ মারা যাবে বা অকর্মন্য হয়ে যাবে। সেদিক দিয়ে বন্দী শিবিরই সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। এখানে যত খুশী বন্দী মরুক কারও দায় দায়িত্ব নেই। হেরম্যান জোহানকে জার্মানীতে বিদ্বান লোকেরা সবাই চিনত। তাই হিটলারের অনুমতি পেতে দেরী হল না।

হেরম্যান জোহান আর তার সঙ্গীরা ল্যাবরেটরীতে যেমন গিনিপিগ বা ইঁদুরের উপর পরীক্ষা চালান হয় সেইভাবে বন্দীদের উপরে পরীক্ষা চালাতে লাগল। কত বন্দী বৈদ্যুতিক শক্ খেয়ে মরে গেল। কতজন পক্ষাঘাতে অচল হয়ে পড়ল তার হিসাব নাই। নির্মম ভাবে ও পরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগল। কেউ মরলে পুঁড়িয়ে ফেলত। ও আর ওর সহকারী ডাঃ ব্যারনের অক্লান্ত চেষ্টায় আর অনেক বন্দীর প্রাণের বিনিময়ে শেষে এই সেভন আবিস্কার হল। ওসব তত্ত্ব আপনিই বেশী জানেন।

যাইহোক এবার পুরোপুরি পরীক্ষার জন্য ওরা অন্য শিবির থেকে খুব বুদ্ধিমান লোক ধরে আনতে লাগল। ঐ সময় আমার বাবাকেও ধরে আনে। আমার বাবা হিটলারের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করতেন না তাই তাকে বন্দী করা হয়েছিল।

বললাম—ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কি করতেন ?

মুক্তা বলল—ফিজিক্সের নামজাদা অধ্যাপক ছিলেন তিনি। নাম ছিল ডুয়েট সার। আমি চমকে উঠলাম—ওহ তুমি ডুয়েটসাহেবের মেয়ে ? আমার বন্ধু ডাঃ এডলফ হানসের বাসায় হাইডেনবুর্গে তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তখন তিনি পূর্ণ যুবক। ছুঁচলো দাড়ি সুন্দর চেহারা। বেশ মনে আছে আমার। আচ্ছা তারপর কি হল।

আমি তখন খুব ছোট আমার মা মারা গেছেন। তাই বাবার অনুরোধে আমাকেও বাবার সঙ্গে বন্দী শালায় রাখা হয়েছিল। তাই সবটা না বুঝতে পারলেও কিছু কিছু বুঝেছিলাম আর এখনও বুঝতে পারছি।

বললাম—তারপর তোমার বাবাকে এরা কি করল। মুক্তা বলে চলল—কয়েকজন বুদ্ধিমান বন্দীকে বাছাই করে জোহান নিয়ে এল তার কাছে। সেভন এস আই কিংবা সেভন এস এইচ প্রয়োগের সফল গিনিপিগ হলেন আমার বাবা। তার সঙ্গে আরও দু একজনও ছিল। আশ্চর্য্যের কথা জানেন যে বাবা নাৎসীবাদের প্রবল বিরোধীতা করেই বন্দী হয়েছিলেন সেই বাবা সেভনের প্রভাবে জোহানের পোষা খরগোশের মত হয়ে গিয়েছিলেন। এই রকম দুতিনজন বুদ্ধিমান বিজ্ঞ লোকের উপর সেভন প্রয়োগ করে যুদ্ধের গতিবিধির ব্যাপার নিয়ে দারুন ভবিষ্যদ্বানী করে জোহান হিটলারের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিল। হিটলার স্বয়ং বারবাসা বন্দী শিবিরে এসে জোহানের কাজ দেখে গেছেন। আর তার আবিস্কৃত কৌশলে ডুয়েটসরের মত বিখ্যাত বিজ্ঞানী কি করে পোষা খরগোশের মত আচরণ করে দেখে তারিফ করে গেছেন। হিটলার এমন কথাও জোহানকে বলে ছিলেন যে গোটা বন্দী শিবিরের সবাইকে সেভোন প্রয়োগ করে হিটলারের অনুগত করে দাও। জোহান নত হয়ে বলেছিল আমারও তাই ইচ্ছা। শুধু বন্দী শিবির নয় বন্দী শিবিরের বাইরে যারা আছে তাদের মধ্যে যারা ফুয়েরারের বিরোধিতা করে সবাইকে এনে একমাস করে রেখে সেভন প্রয়োগ করলে কেউ আর বিরোধিতা করবার মত থাকবে না।

হিটলার খুশী হয়ে এই বিরাট কাজের উপযোগী যন্ত্রপাতি বসাবার জন্য অনেক টাকা মঞ্জুর করে গেলেন। নূতন করে যন্ত্রপাতি বসানোর কাজ শুরু হল। মানুষ কমপিউটার ডুয়েটসার আর আরও তিনজনের উদ্ভাবিত প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়ে সেভন কারখানা বসান হতে লাগল।

ঠিক সেই সময় একদিন সেভন এস এইচ বা ( সুপার হিউম্যান ) প্রয়োগের সময় বাবা যুদ্ধের ফলাফল লিখে ফেললেন। সত্বরই হিটলার পরাজিত হবেন এবং সবাই ধরা পড়বে এই ইঙ্গিত তিনি দিলেন।

জোহান বাবার হিসাব পড়ে বিচলিত হয়ে উঠল। কারণ যে ভাবে হিসাব করে পরাজয়ের কথা বলা হয়েছে তা ভুল হতে পারে না।

জোহান লেখাটা আর কাউকে না দেখিয়ে নিজের কাছে রেখে দিল। এবার ফুয়েরারের স্বার্থের চেয়েও নিজের কথাই তার কাছে বড় হয়ে উঠল। কি করে পালান যায় তাই ভাবতে ভাবতে আবার বাবাকে সেভন এস এইচ প্রয়োগ করে সমাধান দেবার জন্য বলল। এবারও নির্ভুল সমাধান পেতে দেরী হলনা। ও জার্মানী ত্যাগের ব্যবস্থা আগেই করে ফেলল। জোহান প্রচুর টাকাও সরিয়ে ফেলেছিল। যথাসময়ে যে মুহূর্তে হিটলারের পতন ঘটল ও জার্মান ত্যাগ করে সরে পড়ল সঙ্গে হের ব্যারণ···হের চেস আর এর তৈরী তিন মানুষ রোবোট তার মধ্যে আমার বাবাও একজন। আমাকে অবশ্য ইচ্ছা করলেই ফেলে আসতে পারত কারণ তখন বাবার যা অবস্থা তাতে আমাকে ফেলে এলেও বাবা কিছুই বলতেন না তবুও আমাকেও নিয়েই এল।

আমি ঐ তিনজনকে রোবোটই বলছি। কারণ ওরা তিনজনের এই দলবল নিয়ে কিভাবে লুকিয়ে আশা যায়—কিভাবে টাকা পয়সা পাচার করা যায় সব পরামর্শ দিয়েছে। ওদের নিজস্ব চিন্তা বলে কিছুই ছিল না অথচ কি অতি মানবিক চিন্তা এবং কাজের পরিচয় দিত। ওদের পরামর্শেই এই কায়রোর নির্জন পুরাতন দিকে এ পুরাতন ওমরাহের বাড়ী কিনে কি বিরাট কারখানা গড়া সম্ভব হয়েছিল।

তারপর জোহান অফিস খুলে বসল এবং নানা বিষয়ের গাণিতিক এবং বৈজ্ঞানিক সমাধানের জন্য বিজ্ঞাপন দিল।

আস্তে আস্তে খরিদ্দার আসতে লাগল। প্রথম প্রথম আমাকে অফিসে বসাত পরে আমাকে সমাধান পৌঁছে দেবার জন্য রেখে অন্য মেয়ে নিযুক্ত করল। সে কিন্তু গোটা ব্যাপারটার কিছুই জানে না। এমনকি এখানে যে এইসব অঙ্ক কষা হয় তাও জানে না, এইভাবে ব্যবসা বড় হতে লাগল।

কিন্তু একটা ব্যাপার জোহান আগে হিসাব করেনি। পরে যখন বিপদ এল তখন বুঝতে পারল।

কি রকম ব্যাপার? আমি জিজ্ঞাসা করলাম—

মুক্তা বলতে লাগল।

ওরা তখনও ভাবেনি যে মানুষের সব শক্তির একটা শেষ আছে। যতটা শক্তি একটা মানুষের মগজে থাকে তার সবটুকু খাটাবার আগেই হয়ত মানুষটা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু লোকটা বেঁচে থাকতেই যদি সবটুকু শক্তি জোর করে আদায় করা হয় তবে আয়ু ফুরোবার আগেই মানুষটা সম্পূর্ণ ভাবে শক্তিহীন হয়ে পড়বে।

কমপিউটারের দু একটি যন্ত্র খারাপ হলে মেরামত করা যায় তার বদলে অন্য একটা কিছু জুড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু মানুষের মগজের কোটি কোটি কোষের কিছুটা নষ্ট হলেই আর বদলাবার উপায় নেই। সেভন তরঙ্গের সাংঘাতিক চাপে মগজের ক্ষমতা বেরিয়ে আসে ঠিকই—কিন্তু আবার ফুরিয়েও যায়। ফলে কিছুদিন পরে এ মগজের সবটুকু কাজের ক্ষমতা ফুরিয়ে যায়। তখন মানুষটা হয়ে পড়ে অথর্ব অকর্মন্য। বোধজ্ঞান প্রায় থাকে না। যন্ত্রের মত হয়ত কিছু কিছু হাঁটতে পারে। কিন্তু একটা জীবন্ত মমি হয়ে দাঁড়ায়।

আমি অবশ্য প্রথম দিকে কিছু না বুঝলেও সব দেখতে দেখতে এবং পড়াশুনা করে ক্রমে সব বুঝতে পারি। এখানে আসার পর যখন জোহানের ব্যবসা উঠতির দিকে তখন হঠাৎ একদিন বাবা কেমন পক্ষাঘাতের রোগীর মত অথর্ব হয়ে পড়ে গেলো, কথাও বলেনা খায়ও না যেন জড় পদার্থ।

তার পরদিন জোহান আর হের চেস চুপি চুপি কিছু পরামর্শ করল। পরদিন জোহান এসে বলল তোমার বাবা পাগল হয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে গেছে। আমিত জানি—কেউ বের করে না দিলে কারও সাধ্য নেই যে পিছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে যায়।

আমার কান্নাকাটি দেখে জোহান প্রথম সান্ত্বনা দিল—পরে আমাকে ধমক দিল। এই ব্যাপারের দিন পনের বাদে একদিন এই পুরোনো শহরের এক সরাইখানার সামনে দেখলাম বাবার মৃতদেহটা পড়ে আছে। লোকের কাছে শুনলাম এই সাহেব পাগলটা অনেক দিন ধরে এদিক ওদিক ঘুরছিল। কথা বলত না কিছুদিলেও খেত

না। দুর্বল হয়ে আজ পড়ে মরে গেছে। দেখে কেঁদে ফেললাম—শরীর শুকিয়ে গেছে—পোশাক ময়লা, চুলে জট পাকিয়ে গেছে। সেই বৈজ্ঞানিক ডুয়েটসার আজ এইভাবে মরে পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে জোহানকে খবর দিলাম। জোহান অবশ্য কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ করল। আমাকে সান্ত্বনা দিল। পরে বাবার দেহ নিয়ে এসে এখানে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে পুড়িয়ে ফেলল। এই সঙ্গে আমাকে শাসিয়ে দিল যে একমাত্র আমাকেই ওরা বেরোতে দেয়। আমি যেন ভবিষ্যতে এরকম মৃতদেহ বা এখানকার কাউকে রাস্তায় দেখলে কাউকে কিছু না বলি। কোনও ভাবে এখানকার ঠিকানা যেন আমার মুখ থেকে কেউ না জানে। তাহলে তার পরিনাম খুব খারাপ হবে। আর তাদের আদেশ ছাড়া এক পাও না নড়ি।

এই ঘটনার পর পনেরো বৎসর কেটে গেছে। কত মানুষ ওরা চাকুরীর লোভ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এল, কত মানুষ তিন চার বছর পরে অথর্ব হয়ে গেল, আবার ওরা পিছনের দরজা দিয়ে বের করে দিল। এদিককার লোকেরা সেজন্য এই বাড়ীটাকে পাগলা গারদ বলে। যাদের ওরা বের করে দেয় তারা সম্পুর্ণভাবে সব ভুলে যায়। কোনও কথাই বলতে পারেনা, এমন কি খাওয়াও ভুলে যায়। দুচারদিন পথে পথে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে পথে মরে পড়ে থাকে। বেওয়ারিশ লোকের কবর খানায় স্থান হয়। নতুন নতুন মানুষ নিয়ে আসে চাকুরীর লোভ দেখিয়ে। সেভন দিয়ে একেবারে পোষা খরগোশ বানিয়ে ফেলে সেও আপনি দেখছেনই। রাশি রাশি ডলার উপার্জন করে তাদের দিয়ে পরে কাজ ফুরোলে আবর্জনার মত ফেলে দেয়। কোথা দিয়ে কি হচ্ছে কেউ জানে না। লোকে ভাবে এটা পাগলা গারদ মাঝে মাঝে দু চারটে পাগল পালিয়ে যায়। আমি বললাম ওয়েনেরও কি ঐ দশা হয়েছে। মুক্তা বলল—না ওয়েন ঠিক ফুরিয়ে যায়নি। হঠাৎ বাড়ী যাবার কথা বলতে থাকায় ওকে রিভার্স সেভন (উল্টো দিকে) দিয়ে একেবারে স্মৃতি লোপ করে দিয়ে মুখটা বিকৃত করে আপনার পোশাক পরিয়ে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছিল। ও দু চার

পা গিয়েই ঐ উপর থেকে পড়ে মরে গেছে। ওর দেহটা আপনার দেহ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সব শুনে অবাক হয়ে বসে রইলাম। বললাম আচ্ছা আমাকে নিয়ে কি করবে জান? মুক্তা বলল—সবটুকু ঠিক জানিনা। তবে ওদের কথা আড়ি পেতে শুনে যা বুঝেছি তাতে আগে আপনাকে সেভন দিয়ে পরীক্ষা করবে। যদি তার প্রতিক্রিয়া সাধারণভাবে ওদের চার্টের কাছাকাছি থাকে তবে আপনাকেও রোবোট বানাবে। কারণ আপনার মত বুদ্ধিমান লোক সেভন দিলে খুব উঁচুদরের কাজ করবেন। আর যদি দেখে যে ওটা অন্যরকম হবে—তবে আপনাকে শিক্ষক হিসাবে রাখবে। আমি বললাম—ওরা ত আমাকে সেই প্রস্তাবই দিয়েচে।

—ওটা ওদের আপনাকে ভুল বোঝাবার প্রস্তাব। মুক্তা হেসে বলল—লোভ দেখানও বলতে পারেন। যাতে আপনি সেভন পরীক্ষা নিতে রাজী হন। যদি আপনার পরীক্ষা ওদের ফর্মুলা মাফিক হয় তবে আপনার রক্ষা নাই।

—আর তা না হলে—? আমি প্রশ্ন করলাম। মুক্তা বলল—তা না হলে শিক্ষক হয়ে থাকলে একদিন না একদিন মুক্তি পেতেও পারেন। অবশ্য অসম্ভবই বলা যায়—তবুও আপনার বুদ্ধি খাটালে হয়ত বা পথ পেয়ে যাবেন।

—তাহলে ওদের সেভন পরীক্ষা বিফল করতেই হবে আমাকে?

ঠিক তাই। মুক্তা বলল—কিন্তু কেমন করে পারবেন। সাংঘাতিক শক্তিশালী ঐ চৌম্বক তরঙ্গ—। কাউকেই এপর্যন্ত দেখিনি যে ঐ তরঙ্গের কাছে আত্মসমর্পণ না করে পার পেল। এ পর্যন্ত ত আমার চোখের সামনে এই পনের বছর অন্ততঃ দুশজন মানুষ এই ভাবে চলে গেল। আমি চিন্তিত হয়ে বললাম—চিন্তা করে দেখি। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। এসব কথা জেনে আমার অনেক উপকার হল। হয়ত ভগবান আমাকে পথ দেখাবেন।

মুক্তা গুপ্ত দরজা দিয়ে চলে গেল। যাবার আগে ইলেকট্রনিক টেপ রেকর্ডার চালু করে দিয়ে গেল। সারা রাত ঘুম হল না।

ভোর বেলা ইচ্ছা করেই সংস্কৃত ঈশ্বর স্তোত্র আবৃত্তি করতে লাগলাম। জানি ওদের কানে ঠিক পৌঁছাবে স্তোত্রটা। কিন্তু স্তোত্রটা আবৃত্তি করতে করতেই হঠাৎ আমার মনের চোখের সামনে যেন নূতন রাস্তা খুলে গেল। মনে হল—প্রবল ইচ্ছা শক্তি দিয়ে আমি ওদের সেভন প্রয়োগের প্রভাব কি কাটাতে পাবর না। আমাদের দেশের বিপ্লবী ছেলেরা বৃটিশ পুলিশের সাংঘাতিক নির্য্যাতন নিপীড়ন সহ্য করেছে এই ইচ্ছাশক্তির বলে। তারা গীতা পড়ত। গীতা তাদের মনের প্রেরণা ছিল। গীতার অভ্যাস যোগের ধ্যান প্রানায়াম আমারও কিছুটা করা আছে। আমি কি পারবনা ঐ ধ্যান আর প্রানায়ামের বলে ওদের সেভন তরঙ্গ রুখে দিতে।

মন থেকে যেন উত্তর পেলাম—নিশ্চয়ই পারব।

মনটা হাল্কা হয়ে গেল—। এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

হের চেসের ডাকে ঘুম ভাঙ্গল।

—কি হল ডাঃ বাগচী আপনি ত এতক্ষণ ঘুমান না।

—রাত্রিতে ভাল ঘুম হয়নি—।

—রাত্রি শেষের দিকে একা কি যেন বলছিলেন। অনেকটা কবিতার মত মনে হল।

আমি হেসে বললাম—হ্যাঁ ইশ্বরের উদ্দেশ্যে একটা স্তোত্র বলছিলাম—কিন্তু জানলেন কি করে? যেন কিছুই জানিনা এমনই ভাবে ন্যাকা সাজলাম।

হেরচেস বলল—এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম—তাই কানে এল।
—তবে কি ভাষায় বলছিলেন—

—ওটা সংস্কৃত ভাষা—আমরা হিন্দু—আমাদের মন্ত্র সবই সংস্কৃতে—।

হো হো করে হেসে উঠল—হের চেস—বলল আপনিত বৈজ্ঞানিক। আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। আমি বললাম—হাসবার কিছু নেই। বৈজ্ঞানিকদের অনেকেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। এবং এও বিশাস করি—এই বিশ্বাসের বলে অনেক বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

তাই নাকি—তাই নাকি—চেস মাথা নাড়তে লাগল। বেশ ভাল কথা—তবে এখন কোন বিপদের জন্য ঈশ্বরকে ডাকলেন।

বিপদ ছাড়াও আমরা ঈশ্বরকে ডাকি। আমি চটে গিয়ে বললাম। তাছাড়া আপনাদের হাতে বন্দী হয়ে আছি এটাকি বিপদ নয়?

—তাই যদি হয় চেস বেশ রুক্ষ স্বরে বলল তাহলে আপনি কি ভ াবছেন ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করবেন।

—হাঁ করবেন—আমাদের রামায়ণ মহাভারতে এমন অনেক কাহিনীই আছে। সেগুলি এখানেও নেমে আসতে পারে।

—বটে বটে চেস আবার হেসে উঠল—আচ্ছা দেখাই যাক।

—হ্যাঁ দেখা যাক। আমিও দৃঢ়স্বরে বললাম।

* * * *

তুপুরে জোহান এল। বলল—সকালে হের চেসের সঙ্গে আপনার একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে। না না। আপনার মনের বিশ্বাসে আঘাত দিতে চেষ্টা করা তার উচিত হয়নি। তা থাক—কি স্থির করলেন।

আমি শান্তভাবে বললাম। আপনাদের প্রস্তাবে রাজী হওয়া ছাড়া পথ কোথায়। তাই ঠিক করলাম আপনাদের এখানে শিক্ষকতাই করব।

জোহান করমর্দন করে বলল—অনেক ধন্যবাদ। আপনার মত অভিজ্ঞ শিক্ষক যদি আমার উদ্ভাবিত কৌশলে শিক্ষা দেন তবে তিনমাসের মধ্যে আমি একশ জনকে সেভোন প্রয়োগের মত করে তুলতে পারব। খুব আনন্দিত হলাম। এবার আপনার সেভোন পরীক্ষাটা করে নিতে হয়।

আমি ত আগেই মুক্তার কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে নিয়েছি। তবু বললাম—কেন? এটার কি দরকার।

—ক্ষতি ত কিছুই নেই। জোহান উদাসীনতার ভান করে বলল—তবু বুঝে নেওয়া যাবে এই ফর্মূলা আপনার কতটা কাজে লাগবে। কোন ব্যাপারে কতটা এগোতে পারবেন তাও জানা দরকার।

আমি মনে মনে বললাম—হাঁ তোমাদের মতলব আমার বোঝা হয়ে গেছে। বাছাধন ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি। এবার তোমাদের ফাঁদ দেখাব।

মুখে বললাম—আবার রিভার্স সেভোন দিয়ে স্মৃতিভ্রংশ করে দেবেন নাত।

ছি ছি—সে কি কথা—জোহান যেন খুব লজ্জিত হয়েছে এমন ভাবে বলল। আপনি আমাদের সাহায্য করতে রাজী হলেন আর আমরা আপনার ক্ষতি করব।

* * * *

হুদিন কেটে গেল—। এই হুইদিন আমি হুবেলা প্রাণায়াম ধ্যানের অভ্যাস গুলো খুব ঝালিয়ে নিলাম।

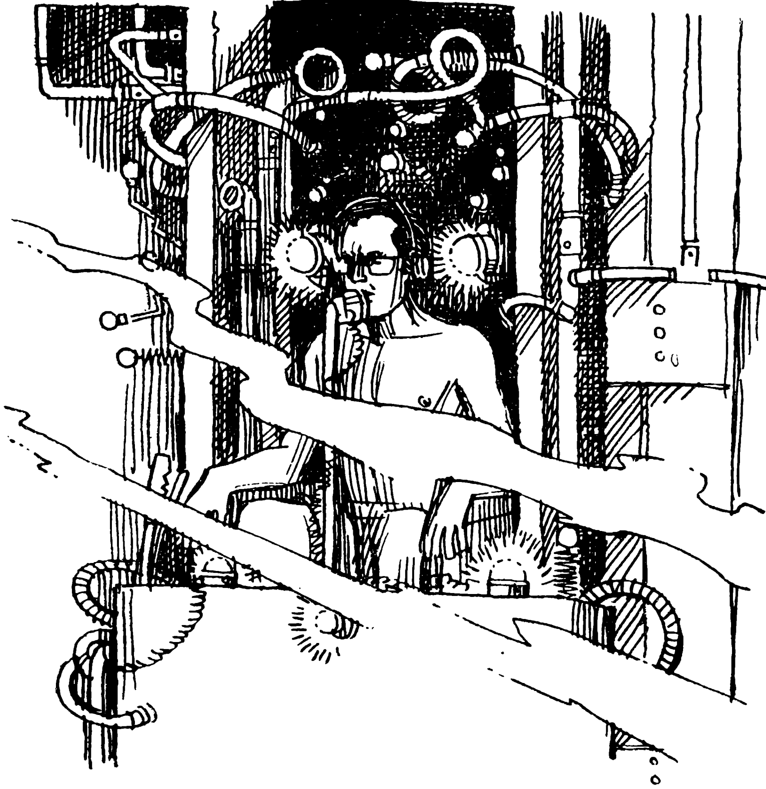
তারপর ওরা আমায় সেভোন টেষ্ট করতে নিয়ে চলল।

প্রথমে ওদের হুই ডাক্তার এল—ডাঃ রাইক আর ডাঃ ক্রাড। হুজনে আমার রক্তের চাপ-নিঃশ্বাসের গতি সব পরীক্ষা করল। ভাইট্যাল ফোরস পরীক্ষা করতে গিয়ে একটু চমকে গেল। ভাইট্যাল ফোরস পরীক্ষা করতে হলে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে একটা নলের মধ্যে নিঃশ্বাস ছাড়তে হয়। আর একটা পিষ্টন উপরে উঠতে থাকে। ঐ বাতাসের চাপে ওটা কতখানি উঠল তাই হল ভাইট্যাল ফোরসের মাপ। সাধারণতঃ খুব ভারী ব্যায়ামের অভ্যাস থাকলে ওটা অনেক বেড়ে যায়। আমারও প্রাণায়ামের অভ্যাসে ওটা অনেক বেশী ছিল। ওরা তাতে একটু বিস্মিত হল। বলল—আপনার ভাইট্যাল ফোরস গড়পড়তা মানুষের চেয়ে অনেক বেশী।

যাই হোক এসব মামুলি পরীক্ষা শেষ হল। এবার আমাকে ছোট হাফ প্যান্ট পরিয়ে খালি গায়ে খালি পায়ে একটা বড় আলমারীর মত চেম্বারে ঢোকানো হল। ঠিক যেন ফাঁসীর মঞ্চে উঠছি এমনই একটা ভয় আমার মনে এল। সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে ফেললাম ভয়টা। ব্যাপার যে কি ঘটবে মুক্তার কাছে আগেই শোনা হয়েছে কাজেই মন স্থির রাখাটা বিশেষ দরকার।

ওরা বলল—আপনার কখন কেমন লাগে আমরা জিজ্ঞাসা করব তার ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন। এই ফোনটা দিয়ে আমাদের কথা শুনতে পাবেন আর এই মাউথপীস দিয়ে আপনার কথা আমাদের

কাছে পৌঁছবে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। মাথার উপরে দেয়ালে চারপাশে নানারকম যন্ত্রপাতি। অল্প অল্প শব্দ হচ্ছে। আমিও আমার মনকে প্রস্তুত করে প্রাণায়াম করে সমস্ত চিন্তাকে দুই ভ্রূর মধ্যে এনে



ফেললাম। প্রবল ইচ্ছাশক্তিকে এক বিন্দুতে এনে চিন্তা করতে লাগলাম যে অবস্থাই হোক না কেন—আমার নিজের ইচ্ছা ছাড়া আর কারও ইচ্ছা আমার উপর খাটবে না। আমার শরীরে যে অনুভবই আসুক না কেন আমায় বশ করতে পারবে না।

হঠাৎ মাথার উপরের যন্ত্রগুলোতে একটা মৃদু শব্দ হল। অনুভব করতে লাগলাম—পায়ের দিক থেকে একটা গরম ঢেউ যেন উঠে

আসছে। উঠে মাথা পর্যন্ত আসছে। বুঝলাম পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। মনকে পুরোপুরি শক্ত করে নিলাম।

এরপরেই আরম্ভ হল গরম লাগা। মনে হচ্ছে আমি যেন সাংঘাতিক রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। ক্রমে গরম বাড়ছেই—গা দিয়ে ঘাম ফুটে বেরুনো উচিত কিন্তু ঘাম হচ্ছে না। ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠল, অসহ্য দম বন্ধ করে দেবার মত গরম। আওয়াজ হল—ডাঃ বাগচী কেমন বোধ করছেন।

কিছুই না—আমি শক্ত আওয়াজে বললাম।—

কোনও অনুভূতি ?—

—না যেমন ছিলাম তেমনই আছি।

চেসের আওয়াজ শুনলাম কি আশ্চর্য্য রুডলফ কত সেভোন চলছে।

রুডলফের উত্তর—সেভোন ডব্লিউ ১৭ ( ওয়ারম্‌থ্‌ ) চেস বলল—তবে যে বলছে কিছু লাগছে না। আচ্ছা আর একটু বাড়াও ত।

আমার ভয় হল—এর পরে আরও বাড়ালে পুড়ে মরব নাকি ?

দেখতে দেখতে গরম বাড়তে লাগল। অসহ্য গরম। প্রাণপনে সমস্ত বোধটাকে মনের বাইরে রেখে প্রাণায়াম করে রইলাম। প্রবল ইচ্ছাশক্তির কাছে যন্ত্র হার মানল।

হের চেসের গলার আওয়াজ শুনলাম—এবার কেমন লাগছে।

জোরে হেসে উঠলাম—কিছুই না—যেমন ছিলাম তেমনিই আছি।

চেস বলল—অদ্ভুত ব্যাপার সেভোন ৩৭-এইচ (হিট) তাতেও কিছু না। বদলাও। মুহূর্তে সব চলে গেল। অত যে গরম তার কোনও পাত্তাই নেই। আসল কথা—আমার পরীক্ষার চেম্বার ত গরম হয়নি। ঐ সেভোন তরঙ্গ দিয়ে আমার স্নায়ুর উপরে কাজ করান হচ্ছিল।

সব স্বাভাবিক হয়ে গেল—একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। একটু পরেই পায়ের দিকে বেদনার আভাস পেলাম। বুঝলাম এবার হবে সাংঘাতিক পরীক্ষা। দেখি আমার প্রবল ইচ্ছাশক্তি তাকেও ভোঁতা করতে পারে কিনা।

বেদনা বাড়তে লাগল। সমস্ত দেহে বেদনা ক্রমেই তীব্র হচ্ছে।

বাড়ছে বাড়ছে—মনে হয় সারা শরীর ছিঁড়ে ফেলছে। মাথাটা যেন সাঁড়াশি দিয়ে চাপছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ল

বান্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক
সাঁড়াশি করিয়া দগ্ধ

আমারও সেই অবস্থা হয়েছে। বান্দাও একটি শব্দ করেন নি। আমিও করলাম না। হের চেসের গলা শুনলাম—কই লোকটা ত চিৎকার করছে না। সেভোন পি. ( পেইন ) ১৩৮এও চুপ করে আছে।

রুডলফ বলল—জিজ্ঞাসা করুন।

আমাকে বলার আগেই আমি প্রাণপনে ঝাঁকুনি দিয়ে হোহো করে হেসে উঠলাম।

চেসের আওয়াজ শুনলাম—হাসছেন কেন ?

আমার চোখে তখন বেদনায় দর দর করে জল পড়ছে তবুও দাঁতে দাঁত চেপে বললাম—হাসব না ত কি এত কাতু কুতু লাগছে যে কি বলব। আমার আবার কাতুকুতুটা একটু বেশী।

এবার জোহানের গলা—কাতুকুতু। সেভোন পি· ১৩৮ এ কাতুকুতু। আর আমাদের সেভোন তরঙ্গে কাতুকুতু দেবার ব্যবস্থা ত নেই। লোকটা অসাধারণ। অন্য মানুষের কারও সঙ্গে মিলছে না। আচ্ছা বদলাও।

এক সেকেণ্ডে সব বেদনা চলে গেল।

একটু বিশ্রাম দিন। এবার এল অদ্ভূত ভাব। মনে হল আমি যেন কোন আনন্দের রাজ্যে এসে পড়েছি। এখানে আকাশে আনন্দ, বাতাসে আনন্দ সব পরিবেশ ভুলে যাচ্ছি। কোথায় আছি কোথায় যাচ্ছি সব ভুল হয়ে গেছে। আরাম আরাম আর আরাম। এই কি স্বর্গ। হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে প্রাণায়াম করে প্রবল ইচ্ছাকে মনে নিয়ে এলাম। এ আনন্দে অভিভূত হব না।

এদের ব্যবস্থা ভণ্ডুল করতেই হবে।

—হুহু করে কেঁদে উঠলাম।

জোহানের বিস্মিত জিজ্ঞাসা—একি কাঁদছেন কেন ?

উত্তর দিলাম—কাঁদব না বড় কষ্ট ওঃ কি কষ্ট—কি বেদনা। এই নি র্য্যাতন চালাচ্ছেন আবার বলছেন কাঁদছেন কেন।

আশ্চর্য্য! জোহান বলে উঠল—সেভোন জে (জয়) ২২৫এ বেদনা—। কি উল্টোপাল্টা ব্যাপার। লোকটার মগজের সব কিছুই ওলোট আগেই হয়ে আছে।

চেস বলল—পাগল নয় ত ?

জোহান বলল—না পাগল হবে কেন ? যে ধরনের গবেষণা ও করছে তাকি পাগল করতে পারে।

মুহুর্তের মধ্যে সব চলে গেল।

আমি ভগবানকে স্মরণ করলাম। ছোটবেলা থেকে যোগ প্রাণায়াম আর ঈশরভক্তির ফলে যে আসাধারণ ক্ষমতা হতে পারে তা জোহানরা বুঝতে পারছে না। ওদের ধারণা এই সেভোন তরঙ্গের কাজ কেউ উলটে দিতে পারে না। কিন্তু আমি যে ঠিকমত সব বুঝেও একেবারে উল্টো বলছি তা ওদের ধারণার বাইরে। মনে মনে স্তোত্র আওড়াচ্ছি —হঠাৎ ঘুম পেতে লাগল। অল্প অল্প করে যেন ঘুম আসছে।

বুঝলাম আবার নূতন সেভোন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এ তরঙ্গ যেন ঠেকান কঠিন। চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে হাত পা সব ঝুলে পড়ছে। না ঠেকাতেই হবে—এ ঘুম থেকে আমাকে পুরোপুরি সজাগ থাকতে হবে। আমার ইচ্ছাশক্তি বাইরের কোনও কিছুকে আমার মনে ঢুকতে দেবে না। প্রাণায়াম করে সব কিছু প্রতিরোধ করতে লাগলাম। হেরচেসের শান্ত কণ্ঠ ভেসে এল—ডাঃ বাগচী কেমন বোধ করছেন ?

কই কিছু নাত।

ঘুম পাচ্ছে না—

মোটেই না—একেবারে নীরস স্বরে উত্তর দিলাম। হাত পা ভারী হয়ে আসছে না ?—

—না বার বার—কেন বিরক্ত করছেন ?

মিথ্যা কথা বলছেন—ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল জোহান।

আপনি মিথ্যাবাদী হতে পারেন—আমি নই।

জোহান বলল—রুডলফ আর একটু বাড়াও।—

সেভোন ডি এস ( ডিপ স্লিপ )

এবার আর নিজেকে রাখতে পারছি না মনে হচ্ছে। রাখতেই হবে—ঠিক রাখতেই হবে হে ঈশ্বর।

কণ্ঠ ভেসে আসছে—মনে হচ্ছে কোন দূর তারার দেশ থেকে—

ডাঃ বাগচী

উত্তর দিলাম—অনেক চেষ্টাতে—বলুন। সামনের হ্যাণ্ডেলটা ধরুন ত।

হাত ভারী—উঠছে না—মনে মনে আওড়াচ্ছি ধরতেই হবে—আমার সব শক্তি একখানে করে ওটা ধরতেই হবে।

এক ঝাঁকুনি দিয়ে হ্যাণ্ডেলটা ধরে ফেললাম। প্রবল এক টান মেরে হ্যাণ্ডেলটা ঘুরিয়ে দিলাম।

থামাও—আর ঘুরিও না। সব ঘুম চলে গেল—সোজা হয়ে বসলাম।

জোহান বলল—চেস—ব্যাপারটা কি। যন্ত্রপাতি বিগড়ে গেল নাকি।

আমি চেচিয়ে বললাম না যন্ত্রপাতি বিগড়োয়নি। কিন্তু তোমরা যা হিসাব করছো আমি তার এক আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম। এবার আমায় ছাড়।

না—আরও তু একটা কিছু দেখি। এবার নূতন তরঙ্গ এল—আমার মনে হতে লাগল আমি পৃথিবীর সব কিছু জানি। সব সমস্যার উত্তর আমার হাতের মুঠোতে। ধীরে ধীরে আমার অঙ্কের ফর্মূলা মনে এল। তার সমাধান জলের মত মাথায় এসে গেল। আশ্চর্য্য মনে হতে লাগল পৃথিবীর যত রহস্য আছে আমি সব জানি।

বুঝলাম। এইবার সেভোন এস আই (সুপার ইনটেলেক্‌ট ) দেওয়া হচ্ছে। এবার যদি প্রকাশ করে ফেলি তবে আমাকে ওরা রোবোট বানাবে। সব প্রতিরোধ করে চুপ করে রইলাম।

প্রশ্ন করল—ডাঃ বাগচী—

উত্তর দিলাম না—

আমার দেওয়া অঙ্কটাকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল এই অঙ্কটার কথা মনে পড়ছে—

মনে মনে বললাম মনে ত সবই পড়ছে তবু বলব না।

আবার জিজ্ঞাসা—এর উত্তর কি হবে ?

এবার নাক ডাকাতে আরম্ভ করলাম।

আরে ঘুমোচ্ছো নাকি—

উত্তর দিলাম না। নাক ডাকতে লাগল—।

হেরচেস বলল—কি আশ্চর্য্য ঘুমোচ্ছে।

জোহান বলল—সেভোন এস আইতে ঘুম। একি মানুষ না অমানুষ।

এরপরে আরও কয়েক দফা ওরা সেভোন বদল করল। বিষন্নতা উদাসীনতা ঠাঁণ্ডা সব রকম—পরীক্ষা ওরা চালাল। আমিও সব পরীক্ষাই উল্টো করে দিলাম। তখন ওরা থামল।

বলল—না আর পরীক্ষা করে লাভ নেই। এমন অস্বাভাবিক নার্ভের মানুষ এ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। ওকে বরং শিক্ষক হিসাবেই রাখা যাবে।

বেরিয়ে এলে ওরা আমাকে ওদের নির্দ্ধারিত পানীয় দিল।

আমি বললাম—দরকার নেই আমাকে বরফ জল একগ্লাস দাও।

ওরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

আমি বললাম আপনাদের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এবার আমাকে কোনো প্রশ্ন করবেন না। আমাকে বিশ্রাম করতে দিন কাল কথা হবে।

ওরা আমার অস্বাভাবিক কাজকর্মে বোধ হয় হতভম্ব হয়েছিল।

নীরস গলায় বলল—আচ্ছা যান।

* * * *

গভীর রাতে মুক্তা এল—ঠিক আগের মতই চুপি চুপি। বলল ওদের আলোচনা শুনছিলাম। ওরা আশ্চর্য্য হয়ে গেছে। কিন্তু কি করে আপনি ওদের কে বোকা বানাতে পারলেন ?

আমি বললাম—আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে যোগ আর প্রাণায়াম বলে

কিছু কাজ আছে। এই সব অভ্যাসে মানুষের ইচ্ছাশক্তি এতদূর পর্যন্ত বাড়ান যায় যে মানুষ অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারে। তোমার মনে আছে কিনা জানি না প্রথম যখন তুমি আমার কাছে জোহানের দেওয়া উত্তর নিয়ে যাও সেদিন এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে জোহান যোগ জানে কিনা। তুমি হয়ত তখন বুঝতে পারনি। সেদিন রাত্রে তুমি আমাকে সেভোন তরঙ্গের পরীক্ষার কথা বলে তখন অনেক ভেবে হঠাৎই মনে হল—আমার কাছে এই একটা উপায় ত আছে। আমি সেইদিনই স্থির করেছিলাম যে ওদের সব পরীক্ষা আমি উল্টে দেব।

মুক্তা অবাক হল—বলল আশ্চর্য্য হবারই কথা। কেউ কোনদিন এটা পারেনি। এখন কি করবেন ?

ওদের প্রস্তাবটাই নেব। অর্থাৎ শিক্ষক হয়ে থাকব কিছুদিন। দেখি কতদিনে পালাবার পথ করতে পারি। আচ্ছা মুক্তা তুমি ত মাঝে মাঝে ওদের কাজেই বাইরে যাও! আমি একখানা চিঠি লিখে দিলে ডাকে দিতে পারবে না ?

মুক্তার মুখ শুকিয়ে গেল—বলল—না ওরা আমাকে কাজে লাগায় ঠিকই তবে খুব বিশ্বাস করেনা বাইরে যাবার আগে তন্নতন্ন করে পোষাক ব্যাগ খুঁজে দেখে।

—বাইরে বসে চিঠি লিখে দিতে পার না।

—ওরা আমার পিছনে গোয়েন্দা লাগায়।

সে ঠিক জানেনা কেন তাকে লাগান হয়েছে কিন্তু টাকার লোভে আমার দিকে নজর রাখে।

তবে উপায় কি ?

মুক্তা একটু ভাবল—বলল একটা উপায় আছে। মাঝে মাঝে এক একটা মানুষ অথর্ব হয়ে গেলে ওরা তাকে পিছনের দরজা দিয়ে বের করে দেয়। সেই সময় ওর জামার মধ্যে আমি চিঠি কৌশলে পুরে দিতে পারি। যদি কোন দিন কেউ তার পকেট হাতড়ে দেখে সেই চিঠি পায় তবে আপনার দেওয়া ঠিকানায় দিতে পারে। যদিও গোটা ব্যাপারটাই অনিশ্চিত। তাহলেও চেষ্টা করতে পারা যায়।

—এই চিঠি পুরে দেওয়াতে তোমার বিপদ হবে নাত ?

ধরা পড়লে বিপদ হবেই। তবে সাবধান হয়ে দিতে হবে।

আমার কেমন মায়া বোধ হল। ভারী ভাল মেয়ে মুক্তা—ও যদি বিপদে পড়ে।

আমি বললাম তাহলে থাক—

ও বলল –না—না সে ঝুঁকি নিতেই হবে। আচ্ছা যখন এমন ব্যাপার হবে তখন আপনাকে জানাব।

চুপি চুপি রেকর্ডার চালু করে দিয়ে মুক্তা চলে গেল।

আমি খুব উঁচু গলায় সংস্কৃত স্তোত্র আওড়াতে লাগলাম।

* * * *

পরদিন হের চেস আর হের ম্যান জোহান এল। সুপ্রভাত জানিয়ে বসল।

আমিও পাল্টা অভিবাদন করে বললাম—কি আদেশ হচ্ছে আমার প্রতি।

চেস বলল—ব্যঙ্গ করছেন ?

বললাম—এতবড় একজন বিজ্ঞানী যিনি মানুষকে বদলে ফেলতে পারেন তাঁকে ব্যঙ্গ করব আমি ? একটা সাধারণ মানুষ ? অসম্ভব।

জোহান বলল—না আপনি সাধারণ মানুষ নন মশায়। আপনার নার্ভগুলো মানুষের মত নয়—সেভোন পরীক্ষায় অন্তত তাই বোঝা গেল।

আমি হেসে বললাম—শিম্পাঞ্জীর নার্ভের মত বোধ হয়। একবার শিম্পাঞ্জীকে পরীক্ষা করে দেখুন না।

জোহান গম্ভীর হয়ে বলল—বুঝলাম আপনি সত্যি সত্যিই আমাকে ঠাট্টা করছেন। যাক সেকথা আপনি নিশ্চয়ই শিক্ষক হিসাবে কাজ করতে রাজী আছেন ?

—তাত আছি—কিন্তু শেখাব কাকে ?

চেস বলল—তারজন্য চিন্তা কি। আপনার ছাত্ররা এক সপ্তাহের মধ্যেই এসে পড়বে।

চেস—অনেকগুলো খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের কাটিং দেখাল।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই নানা ভাষায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। অংক ফিজিক্স কেমিষ্টির সাধারণ জ্ঞান থাকলেই হল। এ্যাষ্ট্রনমি পলিটিক্স ইত্যাদির জ্ঞান যুক্তদের জন্য আলাদা বিজ্ঞাপন। যা লোভনীয় সর্ত দেওয়া হয়েছে তা যে কোনও লোককে টেনে আনবার পক্ষে যথেষ্ট।

ফাইল খুলে দেখাল অজস্র দরখাস্ত এসেছে পৃথিবীর সব দেশ থেকে। এশিয়া থেকেই বেশী। দরিদ্রের দেশ ত। ভারতীয়ও বেশ কিছু আছে। আপাততঃ ভারতীয় কাউকে নিচ্ছে না। আমি ভারতীয় হঠাৎ যদি কাউকে চিনে ফেলে সব ফাঁস করে দিই সেজন্য।

চেস বলল—এরমধ্যে ইণ্টারভিউ নিয়ে বাছাই হয়ে গেছে। সবাইকে প্লেন ভাড়া পোষাক ভাতা এবং তুমাসের বেতন আগাম দেওয়া হয়ে গেছে। আশা করছি এক সপ্তাহ পরে আপনার কাজ সুরু হয়ে যাবে। এ কয়দিন বিশ্রাম নিন খান দান আর ঘুরে বেড়ান।

ঘুরে বেড়াব। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম আপনারা কি রসিকতা করছেন—কোথায় ঘুরে বেড়াব ?

ভুল হয়েছে—চেস হেসে বলল—মানে এই বাড়ীরই ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়।

আমি বললাম—আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করব। আপনারা কি এই গোলক ধাঁধার বাইরে কোথায়ও যান না।

কেন যাব না—জোহান নির্বিকারভাবে উত্তর দিল মাঝে মাঝেই যেতে হয়। জিনিষপত্র কেনাকাটা করতে হয় এতগুলো লোকের খাবার ব্যবস্থা করতে হয়। এসব কি এখানে বসে থেকেই হয় নাকি।

আমি অনুরোধের স্বরে বললাম—ঐ সময় আমাকে একটু বাইরে নিয়ে যাবেন।

সর্বনাশ। হেরম্যান জোহান চেঁচিয়ে উঠল—হ্যাঁ মশায়—আমাকে কি আপনি শেষ পর্য্যন্ত বোকা বলে ঠাওরালেন। আপনি বাইরে গেলেই ত পালাতে চেষ্টা করবেন। লোকজন জড় করবেন চেঁচিয়ে যে দেখ সবাই আমি মরিনি আমাকে এরা জোর করে আটকে রেখেছে। দেখুন ডাঃ বাগচী আপনি বুদ্ধিমান লোক সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি

সুপার হিউম্যান। আমার কাজ অঙ্কের হিসাবে ছক বেঁধে চলে—একটুও ভুল হয় না। শুধু একটা ভুল ঃ—

ডাঃ বাগচীকে এখানে আনা নয় কি ? আমি সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা আঘাত দিলাম। আপনার অঙ্কের হিসাবে মিলল না লোকটা।

তা ঠিক শুকনো হাসি হেসে জোহান জবাব দিল···তবে সেটাও ভুল নয়···। একজন শিক্ষকের দরকার ত ছিলই।

এনেছিলেন ত আমাকেও রোবোট করবার জন্যই কিন্তু সেভোন মেলাতে পারা গেল না। রোবোট করলে হয়তবা সেভোন এস এইচ দিলেন আমি তাতে গিয়ে দিলাম হাত পা ছুঁড়ে—

ইচ্ছে করেই ভঙ্গি দেখাতে গিয়ে ধাক্কা মেরে চেসকে চেয়ার থেকে ফেলে দিলাম। চেস বিরক্ত হয়ে বলল—এটা কি হচ্ছে।

—আমি হেসে বললাম সেভোনের ক্রিয়া।

জোহান বলল—আচ্ছা ওরা যে ভাল আছে ওদের কাছে শুনতে আপনার বিশ্বাস হল না।

—হয়েছে বৈকি। ওরা খুব ভাল আছে নিঃসন্দেহে। ওরা শান্তিতে আছে কিন্তু কবরের শান্তি।

—যাক ও নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। আপনাকে আর একবার বলছি—শিক্ষক হিসাবে কাজ করে দেবেন এরমধ্যে যেন অন্য কিছু করবেন না। তাহলে।—

কি আর করবেন।—মেরে ফেলবেন এই ত। মরে ত গেছিই—না হয় সত্যি মরব। রিভার্স সেভোন দিয়ে স্মৃতিভ্রংশ করান আমাকে যাবে না। দেখেছেন ত নিজেরাই পরীক্ষা করে।

—কথা কাটাকাটি করে কারও কিছু হবে না। সময়ে কাজ চাই—জোহানের এক কথা। ওরা দুজন চলে গেল। আমিও শুয়ে পড়লাম।

গভীর রাত্রে মুক্তা এল তেমনি চুপি চুপি। বলল—ওরা নিজেরা বলাবলি করছিল বাগচী যে এমন ধরনের বেয়ারা আগে জানলে ওকে আনতাম না। তা আপনি ত শিক্ষক হতে রাজী হয়েছেন।

—হ্যাঁ হয়েছি। কিছু ফন্দি বের করবার সময় চাই বলে। এখন

বেয়ারাপনা করলে হয়ত মেরে ফেলবে। আচ্ছা তুমি ত অনেক দিন এদের সঙ্গে আছ খবরও জান অনেক কিছু। এরা যাদের চাকুরীর লোভ দেখিয়ে আনছে তাদের মাইনেপত্র দেয় ?

মুক্তা মাথা নেড়ে বলল মোটেই না।

সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে থাকতে ওর কথায় আবেগ যেন একেবারেই থাকে না। তবুও বেশ ঘৃণার সঙ্গে ও বলল ইণ্টারভিউ হয়ে গেলে একবারে যাতায়াতের জন্য ভাড়া পোষাক পরিচ্ছদের জন্য টাকা আর ছতিন মাসের আগাম মাইনে বলে বেশ কিছু ডলার ওদের দিয়ে দেয়। ওরাও ভাবে কি বিরাট চাকুরী পেলাম। ব্যস্ একবার এখানে ঢুকলেই এক সপ্তাহের মধ্যে সবাইয়ের গডফাদার হয়ে যায় জোহান। তখন কে আর বাড়ীর কথা ভাবে বা মাইনে পত্তরের কথা ভাবে। আপনিও তা দেখেছেন।

আমি বললাম—তাহলে শেষ পর্য্যন্ত পিছনের দরজা দিয়ে চলে যাওয়া—

ঠিক তাই মুক্তা ঠোঁটে দাঁত চেপে বলল কাজ করতে করতে যখন মগজের শেষ শক্তিটুকুও আর থাকে না তখন পেছনের দরজা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। তারপর রাস্তায় পড়ে থাকা। এই হল এদের ভাগ্য। বাড়ী থেকে ভাবে চাকুরী করতে গিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল লোকটা। ঠিকানা কেউ জানে না।

—কেন ইণ্টারভিউ অফিস ?

—সব অস্থায়ী ছ তিন মাসের জন্য ভাড়া নেয়। কেউ পাত্তা জানে না। অথচ এদেরই হাত দিয়ে কি প্রচণ্ড উপার্জন হয় তা ভাবা যায় না।

আমি বললাম—আচ্ছা এই কায়রো সহরে এক আঁধার গলির মধ্যে কারখানা না করে সহরে করে না কেন ?

—ধরা পড়ার ভয়ে। —আর যাবেই বা কেন। এদের এজেণ্ট আছে অনেক জায়গায় সে সব জায়গা থেকে হাতফেরতা হতে হতে কাজ এখানে আসে। মোটামোটা কমিশন পায় এজেণ্টরা—তারাও জানেনা কোথা দিয়ে কি হচ্ছে। তারা আগে কমিশন নেয়। এমনকি

যে মেয়েটা অফিস করে বাইরে বসে আছে যার কাছে আপনি কাজ দিয়েছিলেন সেও জানে না এদের কারখানাটা কোথায় বা কি ভাবে কি হয়। তবে একবার যে এখানে কাজ করিয়ে নিয়েছে তাকে আবার ঘুরে আসতেই হবে। এত সুন্দর নিখুঁত কাজ পৃথিবীর কোথাও কম্পিউটার করতে পারবে না। সেত আপনি দেখেছেনই।

আচ্ছা এদের আয় কেমন ?

মনে হয় খরচ খরচা বাদে বছরে দশ কোটি ডলার। আরও কাজ আসছে—যেজন্য আরও লোক নেওয়া হবে।

তোমাকে কিছু দেয় ?

খাওয়া দাওয়া—জামা কাপড় প্রসাধনী সবই দেয়। নগদ কিছু দেয় না। যা দরকার হয় জানালেই নিজেরা এনে দেয়! আমার কোনও দোকানে যাবার অধিকার নেই।

বললাম—মুক্তা তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমার কাছ থেকেই সব খবর পাচ্ছি। যদি কোন দিন এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারি তোমাকেও দেশে পাঠিয়ে দেব।

মুক্তা বলল—আমার ত দেশে আর কেউই নেই—থাকলেও জানি না।···

আমার হঠাৎই মনে পড়ল—আমার বন্ধু ডাঃ এডলফ হানসের কথা।

বললাম—দেখা যাক যদি বেরোতে পারি তোমারও ব্যবস্থা হবে।

মুক্তা আস্তে আস্তে চলে গেল।

*　　*　　*　　*

ক্যালেণ্ডারের হিসাবে তিনমাস কেটে গেছে। নূতন দলে একশ জন এসে গেছে। ওদের প্রাথমিক সেভোন পরীক্ষা হয়ে গেছে।

এখন এই একশ জন যুবক জোহানকে গডফাদার বলে। খেতে বসে আগে স্তবগান করে নেয়। জোহানের আদেশ মত আমি ওদের অঙ্ক আর ফিজিক্স একটু ভাল ভাবে পড়িয়ে দিচ্ছি। অবশ্য সেটাও ঐ জোহানেরই আবিষ্কৃত কৌশলের সাহায্য নিয়ে। আশ্চর্য প্রতিভাধর বিজ্ঞানী এই হেরম্যান জোহান। শেখানোর এমন অদ্ভুত যান্ত্রিক

কায়দা যে থাকতে পারে এ ধারণাও করা যায় না। মানুষের গোটা স্নায়ুতন্ত্র যেন ওর কাছে ছবি হয়ে ভাসছে। গোটা প্রতিভাই যদি বিপথে না যেত তবে ও এই একটা দিক দিয়েই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলে অভিহিত হতে পারত।

তবে ওর কায়দায় এই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের সেভোন তরঙ্গও দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ অঙ্ক আর ফিজিক্স জানা ছাত্র প্রায় মাধ্যমিক স্কুলের স্ট্যাণ্ডার্ড যাদের তারাও তিনমাসে এম. এস. সি. ফাষ্টক্লাশ পাবার উপযুক্ত হয়েছে। এর উপরে যখন সেভোন এস এইচ ( সুপার হিউম্যান ) অথবা এস. আই. ( সুপার ইনটেলেক্ট ) দেওয়া হয় তখন পৃথিবীর অঙ্ক বা ফিজিক্সের যে কোন সমস্যা ওদের কাছে যোগ বিয়োগ অঙ্কের মত সহজ হয়ে যায়। দিন ত যাচ্ছে। আমি বের হবার রাস্তাও পাচ্ছি না। বাড়ীতে সবাই আমার অপমৃত্যুর সংবাদ পেয়ে গেছে নিশ্চয়ই। টাকা পয়সার দিক দিয়েও নিশ্চয়ই অভাব সুরু হয়েছে। এসব ভেবে মাঝে মাঝে বেশ দুঃখ লাগতে থাকে।

মুক্তা এখন মাঝে মাঝেই আসে। ওর সঙ্গে কথা বলে মনের ভারটা কমে। ওর ত আর মনখুলে কথা বলার মত দ্বিতীয় লোক নেই।

একদিন রাত্রে মুক্তা এল। বলল ডাঃ বাগচী সুযোগ এসেছে। একজন রোবোট সেলিম (স্বম্ভবতঃ ইরানের লোক) অকর্মন্য হয়ে গেছে। একে আজ ভোরে পিছনের দরজা দিয়ে বের করে দেবে। এখন ডঃ রাইক ওকে ইনজেকসন দিয়ে ফেলে রেখেছে। আপনি চিঠি লিখুন সংক্ষেপে। আমি ওকে দেখতে যাবার অছিলায় ওর জামার মধ্যে দিয়ে আসব। হঠাৎ কোনও সুযোগ আসে কিনা। কারণ পাগল দেখলে অন্ততঃ চোরেরাও ওর পকেট হাতড়াবে। যদি সেরকম কেউ পেয়ে আপনার বন্ধুর কাছে পৌঁছে দেয় তবে সুযোগ এলেও আসতে পারে।

আমি হেসে বললাম সেটা ঠিক। অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া। কিন্তু তোমার বিপদ হবে না ত। —সাবধান হতে হবে-মুক্তা বলল-কিন্তু বিপদের ঝুঁকি না নিলেত হবেনা।

তখন আমি কাগজ নিয়ে মামুদ বের ঠিকানা লিখলাম আরবী

ভাষায়। তারপরে লিখলাম ইল্লি আল জান হাইউন ওয়ালা মাইয়েতুন” অর্থাৎ আমি মরিনি আমায় বন্দী করেছে। তারপর এই জায়গাটার একটা নিশানা দিলাম। মুক্তা চিঠিখানা নিয়ে চলে গেল।

* * *

পরদিন হেরচেস এসে আমায় অভিনন্দন জানাল। বলল—ডাঃ বাগচী আপনার ছাত্ররা বেশ শিখে ফেলেছে। তিনদিন পরে ওদের পুরোপুরি কাজে লাগান হবে। পৃথিবীর ছয়টি দেশ থেকে প্রায় এককোটি ডলারের কাজ এসেছে। নানা রকমের কাজ। হেরম্যান জোহান নিজে সব ভাগ ভাগ করে কাকে কোনটা দেওয়া হবে স্থির করেছেন। এত কাজ এসেছে যে নূতন পুরাতন সব কয়জনকে একসঙ্গে কাজে লাগিয়ে এর উত্তর বের করে দিতে হবে। সময় কম।

আমি বললাম বেশ ভাল কথা—চলুন আমার ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ করে আসি। হেরম্যান জোহান, হের চেস আর আমি তিনজনে ওদের কাছে গেলাম।

প্রকাণ্ড হলঘরে সারি সারি একশ বিছানায় একশ জন নূতন রোবোট শুয়ে আছে। জোহানকে দেখেই সবাই একসঙ্গে এ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে গেল। বলল সুপ্রভাত গড ফাদার।

জোহান বলল—সুপ্রভাত—ভদ্রগণ কেমন আছেন। সবাই একসঙ্গে বলল—খুব ভাল খুব ভাল—এর চেয়ে ভাল কেমন করে মানুষ থাকতে পারে।

জোহান—আপনাদের নূতন কাজ কেমন লাগছে।

সবাই একসুরে গেয়ে উঠল—আমাদের নূতন জীবন দিয়েছেন গডফাদার। আমাদের ভিতরে এত শক্তি ছিল অথচ আমরা কিছুই জানতাম না। গডফাদার সে খবর আমাদের দিয়েছেন সেজন্য তাকে ধন্যবাদ দিই।

এবার আর অবাক হলাম না। এতদিনে সবই ত জেনে ফেলেছি। মনে মনে ভাবলাম হায় দু তিন বছরের মধ্যে তোমরা পাগল হয়ে রাস্তায় মরবে। এখনই ত হারিয়ে গেছ আত্মীয় সজনের কাছ থেকে।

তিনবছর পরে যখন রাস্তায় পড়ে মরবে তখন অবশ্য এই বোধটুকুও থাকবে না যে গডফাদার তোমাদের জন্য কি ভাগ্যলিপি লিখেছেন। দেখি ঈশ্বর তোমাদের জন্য আমার হাত দিয়ে কি পাঠান। তখন সত্যি সত্যি আমাকে তোমরা গডফাদার বলো।

* * * *

এতদিন জোহানের সঙ্গে থেকে এবং নিজের আগ্রহে গোটা যন্ত্রগুলোর খুঁটিনাটি সব শিখে ফেলেছি। এরা আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না ঠিকই তবুও আমার অসাধারণ বুদ্ধি, স্মৃতি আর বিজ্ঞানীসুলভ মনটাকে শ্রদ্ধা করে। একদিন ত জোহান বলেই বসেছিল—আমার মৃত্যুর পর ডাঃ বাগচীকে আমার উত্তরাধিকারী করে দিয়ে যাব।

একদিন সকালে চেস এলে আমি তাকে বললাম আমি জোহানের সঙ্গে দেখা করতে চাই। বিশেষ ব্যক্তিগত ব্যাপার। চেস আমায় নিয়ে গেল জোহানের অফিস ঘরে—সেইঘর যেখানে আমি প্রথম দিন জোহানকে দেখেছিলাম।

জোহান বলল—কি মনে করে এসেছেন হের বাগচী।

আমি খুব নতস্বরে বললাম—কাল রাতে হঠাৎ দেখলাম আমার ঘরের ওয়ার ড্রোবে একটা মাউথপীস আছে। আমিও ত বৈজ্ঞানিক বুঝতে অসুবিধা হল না—যে ওটা উন্নত ধরনের রেকর্ডারের মাউথপীস। এতদিন আপনাদের সঙ্গে আছি—একা থাকি কখনও কখনও সংস্কৃত ভাষায় ঈশ্বরের স্তোত্র আওড়াই। এই অবস্থায় ঐ আড়ি পাতবার যন্ত্রের স্বার্থকতা কি? আমার কাছে ত কেউ আসে না যে চক্রান্ত করব। ওটা আমার কাছে মর্য্যাদা হানির মত লাগছে।

জোহান বলল—আচ্ছা আচ্ছা—ঠিক বলেছেন। মর্য্যাদাহানি নয়কি বলে হোহো করে হেসে উঠল। পরে ফোন তুলে নিয়ে কাউকে বলল ওটা সরিয়ে নিতে।

আর কি কথা—আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

মুক্তা যে আমার ঘরে আসে বা আমার সঙ্গে গল্প করে এ বিষয়ে

ওর উপর যাতে এতটুকু সন্দেহ না হয় সেজন্য মনে মনে এক গল্প ফেঁদে এনেছিলাম তাই বললাম।

মাঝে মাঝে খুব হালকা ঘুমের মাঝে মনে হয় সারা গা মাথা সাদা পোষাকে ঢেকে একটা মূর্তি আমার পোষাক বই সব হাতড়ে দেখে। বোধহয় কোন মেয়ে। কাউকে কি আমার কাজকর্ম নজর রাখতে বলেছেন?

জোহান হো হো করে হেসে উঠল। পাগলের মত মাথা নেড়ে নেড়ে বলল—সবটাই স্বপ্ন হের বাগচী। তবে হয়তো বা আপনার ঈশ্বর-স্তোত্র শুনে কোনও এঞ্জেল আসে আপনাকে উদ্ধার করতে। নয় কি?

এরকম ঠাট্টা করবে জেনেও গল্প ফেঁদেছিলাম। এবার বললাম—আর একটা খুব গুরুতর কথা।

বলুন—জিজ্ঞাসা নিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকাল।

—দেখুন আমি ধনী লোক নই···আমার এই নিরুদ্দেশ হবার পর আমার দেশে পরিবার বর্গ নিশ্চয়ই খুব টাকার টানাটানিতে আছে। আমিও আপনাদের অনেক কাজ করে দিলাম—এবার যদি কিছু টাকা আমার দেশে পাঠিয়ে দেন তবে ওরা অভাবে পড়ে না। এবার জোহানের ভুরু আর কপাল আরও কুঁচকে গেল। বলল কিভাবে?

আমি বললাম—আমার ব্যাংকে একাউন্ট আছে। বিদেশী মুদ্রা পাঠাবার অনুমতিও আছে। এখানে ডলার জমা দিলে দেশে ওরা আমার ব্যাংকারের হাত দিয়ে টাকা দেবে।

জোহান বিরক্ত হয়ে বলল—ও হো হো—পাগলের মত কথা বলছেন কেন। আপনার ব্যাংকে এখন টাকা জমা দিতে গেলে কে জমা দিল তার সাত কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে আমি আমার সন্ধান জানাব মনে করেছেন।

আমি বললাম—আপনার এখানে আমি ত সুখেই আছি কিন্তু দেশে আমার পরিবারে টাকার অভাব হচ্ছে ভেবে কষ্ট পাচ্ছি।

এবার বেশ বিরক্তির সঙ্গে জোহান বলল আরে মশাই আপনি ত মরে গেছেন। টাকা পাঠাবে কে? আপনার ভূত। ওরা ধরে নিয়েছে এদিক থেকে আর টাকা যাবে না। এখন ওরা আর ও নিয়ে মাথা খাটাবে না।

আমি বললাম—কিন্তু আমাকে ছাড়বেন কবে। আঁর সে সময় টাকা দেবেন তাই বা কি করে বলি—

জোহান রেগে উঠে দাঁড়াল—বলল যখন আমি মনে করব যে আপনাকে ছেড়ে দিলে চলতে পারে তখন ছেড়ে দেব। আর টাকা দেব কিনা ভাবছেন ? এদিকে আসুন রূপকথার প্লুটাসের রত্ন ভাণ্ডারের গল্প পড়েছেন—এই বলে চাবি দিয়ে ওর চেয়ারের পিছনে বসান ষ্টিলের আলমারী খুলে ফেলল।—বলল দেখুন জোহানের টাকার অভাব নেই আপনার মত একটা ছিঁচকে প্রফেসারকে দেবার মত টাকার অভাব তার হবে না।

দেখলাম সমস্ত আলমারীতে নোট। তাড়া তাড়া নোট, একশ দুশ পাঁচশ ডলারের নোট রাশি রাশি। কত যে নোট হবে হিসাব করা সম্ভব নয়।

আলমারী বন্ধ করে বলল—যাবার সময় একটা ব্যাগ ভর্তি করে নিয়ে যাবেন। এবার যান।

আর কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়লাম। আমার যে কাজ ছিল সবই হল। রেকর্ডার সরানো। মুক্তার উপরে যাতে সন্দেহ না হয় তাই করা, আর এই নরকের কুবেরের ধনভাণ্ডার কোথায় তা জানা।

খুশী মনে ফিরে এলাম।

খুব মন দিয়ে এই বিরাট কারখানার সব যন্ত্রপাতির সম্পূর্ণ কারিগরি জেনে ফেলেছি। কারণ এই যন্ত্রপাতির মধ্য দিয়েই আমাকে মুক্তির পথ খুঁজতে হবে।

লক্ষ্য করলাম জেনারেটর থেকে সেভোন তরঙ্গ যেখানে শেষ বার মাপা জোঁখা হয়ে ওদের পরিবেশক যন্ত্রে যায়—সেখানে ছটা তামার নল আছে। সবগুলোই ফাঁপা, আর মুখগুলো খোলা। ঠিক তার উপর দিয়ে স্প্রে করবার মত সূক্ষ্ম ধারায় জলীয় বাষ্প চলতে থাকে। রুডলফকে জিজ্ঞাসা করলাম। ও বলল সেভোন হল রেডিও চৌম্বক তরঙ্গ মিশিয়ে তৈরী করা কম্পন। এই নল দিয়ে ওর শেষ বারের গতি এর মুখ খোলা কারণ বাড়তি বিদ্যুতটা এখান দিয়ে ঐ জলমিশ্রিত

বাতাসে টেনে নেয়। আপনাকে ত শেখাতে হবে না। যে জল বিদ্যুতের কণ্ডাকটার।

আমি বললাম—আচ্ছা এই মুখগুলো বন্ধ থাকলে কি ক্ষতি হত।

রুডলফ খুব গম্ভীর হয়ে আমার মত মনোযোগী এবং নম্র ছাত্রকে বোঝাতে লাগল—মনে করুন জেনারেটর থেকে কিছু বাড়তি তরঙ্গ এসে গেল। ঐভাবে যদি শুষে না নেয় তবে চূড়ান্ত পর্য্যায়ে যে টুকু তরঙ্গ মানুষকে দেব একবার তা না হয়ে বেশী হয়ে যাবে। তাতে তরঙ্গ প্রয়োগটা আমাদের হিসাবের বাইরে যেতে পারে। তাতে সব কিছু ওলোট পালট হয়ে যাবে। খুব আনন্দ লাগল। ছিদ্রপথ পেয়ে গেছি! এই ছিদ্র দিয়েই তোমাদের গোটা প্ল্যানে শনি ঢুকিয়ে ছাড়ব।

মনে মনে হেসে রুডলফকে জিজ্ঞাসা করে করে ওর বাকী রহস্যটুকু সম্বন্ধেও নিশ্চিত হয়ে ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফিয়ে এলাম।

* * *

রাত্রিতে আবার জোহানের বই খুলে বসলাম। দেখলাম সেভোন এস আই (সুপার ইনটেলেক্‌ট ২৩০ সেভোন এস এইচ) সুপার হিউম্যান ২৩৫ আর সেভোন এ (এ্যাঙ্গার-রাগ) ২৪০ ওরা কঠিন অঙ্ক বা প্রশ্নের সমাধানের জন্য মানুষ রোবোটকে সেভোন এস আই বা এস এইচ দেয়।

এখন যদি কোনও রকমে ঐ নলের বাড়তি বিদ্যুৎ টাকে জলীয় বাষ্পে শুষতে না দিয়ে জেনারেটরে ফেরৎ পাঠাতে পারি তবে জেনারেটর থেকে ২৪০ সেভোন পাঠাবে। ভাবতেই আনন্দে মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। কিন্তু জেনারেটরে ফেরৎ পাঠাতে পারে অথচ নলগুলোর ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া যায় এমন কি আছে। চিন্তা করতে করতে মনে হল কারবন। হ্যাঁ কারবনই পারবে একাজ করতে। কিন্তু কারবন জোগার করি কি করে। সহজ কারবন কি? হ্যাঁ কয়লার গুঁড়ো। ঠিক কথা। কয়লার গুঁড়ো নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

রাত্রে মুক্তার দরজায় সাংকেতিক টোকা লাগালাম। টেপ রেকর্ডারের রিসিভার সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ভয় নেই।

মুক্তা এল। কি ব্যাপার ?

বললাম-রেকর্ডার সরিয়ে ফেলেছি সেজন্য নির্ভয়ে টোকা দিলাম। যাই হোক খানিকটা কয়লার গুঁড়ো দিতে পার।

মুক্তা একটু চিন্তা করে উত্তর দিল এবাড়ীতে ত কয়লার ব্যবহার নেই—দেব কোথা থেকে।

হঠাৎই মনে হল ড্রাই সেলের ভিতরের কার্বন স্টিকের কথা।

বললাম ড্রাই সেলে চলে এমন টর্চ আছে ?

বলল হ্যাঁ আছে। হঠাৎ প্রয়োজন হতে পারে বলে কয়েকটা টর্চ রাখা হয়।

উৎসাহিত হয়ে উঠলাম বললাম ঐ রকম ছয়টা সেল আমাকে দাও।

মুক্তা কেমন গোলমালে পড়েছে মনে হল বলল ওগুলো দিয়ে কি হবে।

মৃত্যুবান তৈরী হবে বুঝেছ—এই নরকের চক্রান্তের মৃত্যুবান তৈরী হবে। তুমি ছয়টা সেল আর একখানা শক্ত ছুরি—আর কিছু কাগজ এনে দাও।

মনে মনে ভাবলাম—এই ভাল হবে। ফাঁপানলের মধ্যে টুপ করে ছেড়ে দেওয়া সহজ হবে। আর একেবারে বিশুদ্ধ কার্বণ! কয়লার গুঁড়োর চেয়ে অনেক ভাল হবে।

মুক্তা একটু পরেই জিনিষগুলো দিয়ে চলে গেলে আমি সেলগুলো ভেঙ্গে ওর ভিতরের কার্বণ ষ্টিকগুলো বের করে নিয়ে গুঁড়ো গুলো কাগজে জড়িয়ে ওয়ার ড্রোবে রেখে দিলাম।

তারপরে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়লাম। মনে মনে ভাবলাম—কাজ ঠিক পরিকল্পনা মাফিক এগোলেই সব শেষ করে ফেলব।—আমার নরকে বাস করবার দিন অবসান।

* * *

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই জোহানের ঘরে গেলাম।

সুপ্রভাত হেরম্যান জোহান—

সুপ্রভাত হের বাগচী—আপনাকে আজ বেশ খোশ মেজাজীর মত দেখাচ্ছে।

হবেই ত হেসে বললাম—আমার ছাত্রদের দিয়ে কাজ করাবেন—আমার কাজও শেষ।

হ্যাঁ ওদের দিয়ে দুদিন কাজ করালেই আমি সব অর্ডার শেষ করতে পারব। জান হের এত অর্ডার এসেছে—কল্পনার বাইরে। আর আসবে না কেন, এমন নিখুঁত কাজ এত অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর কেউ করেই দিতে পারবে না।

—ঠিক তাই—আচ্ছা হেরম্যান—এদের কাজ শেষ হলে ত আমি ছাড়া পেতে পারি। অন্ততঃ তাই ভেবেই আজ আমায় খুশী দেখছেন।

মাথা নেড়ে জোহান বলল—সেটা পরে বিবেচনা করা যাবে।

ওখান থেকে উঠে মানুষ রোবটদের ঘরে গেলাম। আমায় দেখে ওরা উঠে বসল।

আমি বললাম—ভদ্রগণ—কেমন আছেন ?

ওরা একসঙ্গে বলল—বেশ ভাল। আর আপনি যা পড়িয়েছেন তাতে আমাদের আজ ফিজিক্সটা একেবারে মুঠোর মধ্যে এসে গেছে।

—দেখুন আমি আপনাদের শিক্ষক। আপনারা আমার ছাত্র। দুনিয়ার সব দেশে শিক্ষককে মান্য করবার নিয়ম আছে। আমাকেও আপনাদের মান্য করা উচিত।

নিশ্চয় নিশ্চয় সবাই এক সঙ্গে বলে উঠল।

তাহলে আমি যদি কোনও উপদেশ বা আদেশ দিই সেটা আপনারা শুনবেন।

নিশ্চয়ই শুনব তবে গড ফাদারের স্বার্থের বিরোধী হলে শুনব না। তাঁর যাতে ভাল হয় তেমন কথা বলুন শুনব।

নিশ্চয়ই সেরকম কথাই বলব। আচ্ছা আপনাদের বাড়ীর কথা মনে পড়েনা।

এক সুরে সবাই বলল—আমরা নিকৃষ্ট মানুষ ছিলাম। গডফাদার জোহান আমাদের নুতন জীবন দিয়েছেন। বাড়ীর ওরা নরকে পচুক।

—সেই একই কথা একই সুর। পুরাতন গ্রামোফোন রেকর্ডের একটা সূত্র যদি কেটে যায় তবে ঘ্যান ঘ্যান করে একই কথা বাজে।

এও ঠিক সেই রকম। যে মানুষ আসবে—সেভোনের ধাকৃকায় সেই একই কথা বলবে।

বলুক। আজই সব কিছুর এসপার ওসপার। প্রচণ্ড বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছি। যদি বিফল হই তবে জোহানরা আমাকে মেরে ফেলবে এও ঠিক। তারা এতবড় শত্রুকে আর বাঁচিয়ে রাখবে না। আর যদি সফল হয় তবে জোহানদের আজই শেষ দিন।

ফিরে এলাম নিজের ঘরে। আমায় যে লোকটা তদারক করে তাকে বললাম—আজ আমি লাঞ্চের টেবিলে যাব না। আজ আমার খাবার আমার ঘরে দিও। সে চলে গেল! আমি দরজা বন্ধ করে মুক্তার দরজায় সাংকেতিক টোকা দিলাম। দিনের বেলায় কখনও ওকে ডাকিনি। ও খুব ভয়ে ভয়ে দরজা ফাঁক করে দেখে নিল তারপর সন্তর্পণে এসে দাঁড়াল।

বললাম মুক্তা আজ শেষ বিচারের দিন—

ও অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

বললাম—বুঝলে না?—ক্রিশ্চিয়ানদের রেগারেকশান আর মুসলমানদের রোজ কেয়ামত আছে না, আজ সেই দিন এসেছে।

ও বলল—বুঝছি না কিছু। আপনার কি মাথা খারাপ হল।

না—মাথা ঠিক আছে—আমি হাসতে হাসতে বললাম।—যা যা বলি সব মনে রেখে ঠিক মত কাজ করবে—তাহলেই ব্যাপারটা বুঝবে।

শোন আজ দুপুরে বাইরে যাবার পোষাক পরে তৈরী হয়ে থাকবে। দুপুরে খাবার সময়ের পর যখন অপারেশন হলে খুব গোলমাল শুনবে সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যাগে কিছু দড়ি নিয়ে আমার পাশে দাঁড়াবে। আর বাইরে যাবার সব দরজা পর পর যাতে খুলতে পার তার ব্যবস্থা করবে। ও তবুও অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললাম—ভয় পেয়োনা যা বলছি সব অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে। এই গোলক ধাঁধার রাস্তা তুমিই একমাত্র ভাল জান। আমাদের পথ দেখাবে তুমি। আজ এই নরকে ঈশ্বর নেমে আসবেন শয়তানের উপরে প্রভুত্ব করতে—আজ পাপীর শাস্তি বন্দীদের মুক্তি। আনন্দ কর আজ।

মুক্তা চলে গেল। কি ভাবতে ভাবতে তা ওই জানে।

আমার কথা আর বলা চলে না। বুক দুরুদরু করছে। ভগবান আমাকে শক্তি দিন। বৃথাই কি ওদের সেভোন পরীক্ষা উলটে দিয়েছি নিজের বেলায়। ভগবান আমাকে ঠিক রাস্তায় নিয়ে চলেছেন।

বেলা নয়টায় গেলাম সেই হলঘরে যাকে বলা হয় অপারেশন হল। দেখলাম একশ বিশটা চেয়ারে সারি সারি নুতন পুরাতন মিলিয়ে একশ বিশজন মানুষ রোবোট। সামনের টেবিলে কাগজ কলম আর সেই উত্তেজক পানীয়। জোহান, হের চেস, রুডলফ, ভাঙার রাইক, ক্রাভ সবাই উপস্থিত। এর আগে এক সঙ্গে এত মানুষকে আর কখনও কাজ হয়ি করানন। খুশীতে হেরম্যান জোহান ছেলেমানুষের মত বকে চলেছে।

সবাই বসল—রুডলফ যন্ত্রের হাতল ঘোরাল। হেরম্যান জোহান সামনে গিয়ে দাঁড়ালে সবাই উঠে দাঁড়াল। সেই একঘেয়ে বিরক্তিকর সুরে জোহানের স্তব গান গাইল।

জোহান সবাইকে আশীর্বাদ করল। সবাই বসে গেলাসের পানীয় এক চুমুক খেল—রুডলফ দরকার মত হাতল ঘোরাল।

জোহানের গলা মাইক্রোফোনে ভেসে এল ভদ্রগণ কাজ আরম্ভ করুন। সবাই টেবিলের উপরে ঝুঁকে পড়ল। প্রশ্নগুলো তুলে পড়তে আরম্ভ করল। রুডলফের হাতল আর একটু ঘুরল। ব্যস্ লেখা সুরু হয়ে গেল। আর সেকি লেখা যেন এক্সপ্রেস ট্রেন চলছে। মনে হয় যেন আঙ্গুল অবশ হয়ে যাচ্ছে—আবার একটু চুমুক দিচ্ছে গেলাসে তারপর লিখছে।

জোহান আমাকে দেখাল, দেখেছেন—হের বাগচী কেমন মহিমাময় দৃশ্য।

আমি বললাম—সত্যি আপনার প্রতিভাকে নমস্কার জানাতে ইচ্ছা হচ্ছে!

এগারটা বাজল।

জোহান রুডলফকে থামাতে বলল। সব থেমে গেল। গেলাসের পানীয় শেষ চুমুক দিয়ে সবাই কলম নামিয়ে বসল।

জোহানের কণ্ঠ ভেসে এল—ভদ্রগণ এবার আপনারা বিশ্রাম নেবেন। ওখানে আপনাদের জন্য আর এক গ্লাসে পানীয় প্রস্তুত রয়েছে। ওটা পান করে একঘণ্টা ঘুমিয়ে নেবেন। বেলা একটায় লাঞ্চ-এ যাবেন। আড়াইটায় আবার কাজ সুরু।

সবাই বের হয়ে এসে হেসে জোহানকে অভিবাদন করে যার যার বিছানায় চলে গেল। যাবার সময় সবাই টলছে। স্নায়ুর উপরে এত চাপ সহ্য করা বেশ কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নেই।

ওরা চলে গেল।

জোহান বলল—হের বাগচী এতবড় কাজ এর আগে আমরা করিনি। আপনাকে ধন্যবাদ যে এতগুলো লোককে আপনি শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছেন। আমি নত হয়ে বললাম—সেও গডফাদারের অনুগ্রহ। শেখাবার এমন প্রণালী আপনি আবিষ্কার করেছেন যা আমার কল্পনাতেও কোনও দিন আসে নি। যদি কোনও দিন বাইরে যেতে পারি তবে এই প্রণালী কাজে লাগাব আর গডফাদারের জয়গান করব।

জোহান একটু অবাক হল—হঠাৎ আমার এই গদগদ ভাব দেখে মনে ভাবল যে সেভোন তরঙ্গের ধাক্কা আমাতেও এসে লাগল কিনা। আমি এটুকু সুযোগের পুরো ব্যবহার করলাম বললাম—সত্যিই হেরম্যান জোহান আপনি সত্যিই গডফাদার। মানুষের জীবনকে যে এইভাবে ভেঙ্গে গড়তে পারে সেইত গড। ঈশ্বর! আপনার সংস্পর্শে এসে আমি ধন্য হয়েছি।

হেরম্যান জোহান হের চেস সবাই খুব খুশী বলল—বেশ বেশ বাগচী আপনার সত্যি কথাতে খুব খুশী হলাম। এরপরও কি বাইরে যেতে চান ?

ইতস্তত করে বললাম—যাব—যখন আপনারা অনুমতি করবেন। না হলে এই আনন্দের কাজ ছেড়ে যাব কোথায় ?

ঠিক কথা—হের বাগচী তুমি এতদিনে বুঝেছ। আমার মৃত্যুর পরে তোমাকে উত্তরাধিকারী করে যাব। আনন্দে জোহান আমাকে তুমি সম্বোধন করল।

জিভ কেটে বললাম হের চেস থাকতে ? না না গডফাদার সে লোভ আমার নেই।

জোহান আমার ফাঁদে পা দিয়েছে খুব আনন্দিত হয়ে বলল সে পরে দেখা যাবে—চল লাঞ্চে যাই।

আমি বিনয় দেখিয়ে বললাম—আমায় মাপ করবেন। আমি আমার ঘরে লাঞ্চ দিতে বলেছি। কারণ আজই সুরু করব গডফাদারের জীবনী লিখতে এই শুভলগ্নে। আপনারা যান। আমি দুটোর সময় এখানে হাজির হব। আড়াইটায় ত কাজ সুরু।

ওরা চলে গেল। আমিও ঘরে ফিরে এলাম। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করছিলাম। মুক্তা এল—বলল ব্যাপার কি ডাঃ বাগচী। ওরা খেতে খেতে বলাবলি করছিল যেকোনও ভাবে বোধ হয় সেভোন এইচ ওয়াই ( হিপনোটিস সম্মোহন ) বাগচীর উপরে কাজ করেছে। এবার ওকে কাজে লাগাতে পারলে দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন সমস্যা যার কঠিন ভবিষ্যদ্বানীও করা যাবে।

আমি হেসে বললাম—বলছিল নাকি ? আমিও ত তাই চাই। যাই হোক যা বলেছি মনে থাকে যেন।

চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লাম। মেসিনঘর নিস্তব্ধ। কেউ নেই সবাই লাঞ্চ ঘরে গেছে। পকেট থেকে ব্যাটারীর ছয়টা কার্বন ষ্টিকবের করে একবার এদিক ওদিক দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। ফিরে এসে একটা একটা করে ষ্টিক নিয়ে তামার নলগুলোর মধ্যে ছেড়ে দিলাম। ষ্টিকগুলো নলের মধ্যে সুন্দর ঢুকে পড়ল। উপর থেকে বোঝা যাচ্ছেনা। নলগুলো পাঁচ ইঞ্চি লম্বা আর কারবন ষ্টিকগুলো বড়জোর আড়াই ইঞ্চি।

কাজ শেষ করে আর দাঁড়ালাম না। উত্তেজনায় গা কাঁপছে। সেভোন পরীক্ষার দিনেও স্থির ধীর হয়ে সবটা সত্য করেছি—কিন্তু আজ কি ভয়ংকর পরিণতি সমস্ত কারখানার জন্য অপেক্ষা করছে ভাবতেই গা শিউরে উঠছে। ঘরময় খালি পায়চারী করে বেড়াচ্ছি। একবার বসছি কিন্তু স্থির হতে পারছিনা। দুটো বেজে পনের মিনিট

হতেই অপারেশন হলে গেলাম। গিয়ে দেখলাম সবাই এসে গেছে। একশ বিশজন মানুষ সবাই যার যার জায়গায় বসে গিয়েছে।

জোহান ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল—ওরা দাঁড়িয়ে উঠে সেই একঘেয়ে স্তবগান ধরল। তারপর কাজে বসে গেল। পানীয় খেল। রুডলফ প্রথম হাতল ঘোরাল—ওদিককার নলগুলোতে কারবন ষ্টিক দিই নাই—তাই ঠিক মতই কাজ আরম্ভ হল। ওরা ঝুঁকে পড়ল কাগজের উপর।

জোহান আদেশ দিল—সেভোন এস আই, দুমিনিট পরে সেভোন এস এইচ—

রুডলফ হাতল টানল। আমার বুকের মধ্যে হাতুরির ঘা পড়ছে দম বন্ধ হয়ে যাবে নাকি।

হঠাৎ রুডলফ বলল—একি ব্যাপার! আমার বুকটা ধ্বক করে উঠল

না বোঝার ভান করে বললাম—কি হল গডফাদার।

হেরচেস চেঁচিয়ে বলল একি ওরা থেমে গেল কেন? চেয়ে দেখলাম ওরা সবাই থেমে গেছে—খাতা কলম রেখে কি যেন ভাবছে।

এমন হল কেন?—

জোহান ওদের দিকে এগিয়ে গেল কড়া গলায় আদেশ করল—একি সবাই বসে আছ কেন? কাজ কর।

ওরা কিছু করল না—চোখ বড় বড় করে তাকালা। হেরচেস চেঁচিয়ে বলল—তোমাদের সামনে গডফাদার-দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাও।

ওরা সব আদেশ উপেক্ষা করে কি যেন ভাবছে-শুধু ভাবছে।

হেরম্যান ডাকল—রুডলফ এদিকে এস ত।

রুডলফ জোহানের কাছে এগিয়ে গেল—জোহান ওকে কিছু বলতে লাগল। আমি একটুও সময় নষ্ট না করে সুযোগের সদ্ব্যবহার করলাম। দৌড়ে গিয়ে হাতলটা আর এক পয়েণ্ট এগিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার কারবন ষ্টিকের কম্পনে সেভোন এস এইচ সেভোন এ-তে (এ্যাঙ্গারে) পরিণত হয়ে গেল।

আমি দৌড়ে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বুক ফুলিয়ে সভায় উত্তেজক বক্তৃতা দেবার মত কায়দায় উচু গলায় বলতে লাগলাম। উত্তেজনায় আমার কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা গেল। হাত মুঠি করে বলতে লাগলাম—ভদ্রগণ—বেরিয়ে আসুন। এই ক্রীতদাসের



জীবন থেকে আজ আপনাদের মুক্তি এসেছে। আপনারা কি বুঝতে পারছেন না এই লোকগুলো আপনাদের রোবোটে পরিণত করে আপনাদের প্রাণের বিনিময়ে মুনাফা লুটছে! বেরিয়ে আসুন, যে লোকগুলো এই অবস্থায় আপনাদের এনেছে তাঁদের বেঁধে ফেলুন

শাস্তি দিন—আপনাদের বেতন চান। আসুন চলে আসুন। আমার এই কথায় জোহান চেঁচিয়ে বলল—চেস, ক্রাভ তোমরা দাঁড়িয়ে দেখছ কি এই ভারতীয় বেইমানটাকে শেষ করে ফেল। এরা দুজন তখন আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি চোখের নিমিষে একখানা চেয়ার তুলে ওদের আঘাত করবার জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম। ওরা তখন তিনজনে আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি চেয়ার দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে করতে বললাম—ভদ্রগণ আপনারা আমার ছাত্র—আমি এদের হাত থেকে আপনাদের মুক্ত করতে চাচ্ছি। এরা আমাকে মারবার চেষ্টা করছে। আসুন আপনারা। এগিয়ে আসুন।

ওরা তখন সবাই একসঙ্গে হৈ হৈ করে উঠল—মার ওদের বাঁধ ওদের—আমরা কেন এভাবে ওদের কাজ করব। বসবার চেয়ারগুলো উচু করে ওরা মারমুখী হয়ে এগিয়ে এল। জোহান আর দলবল পালাবার উপক্রম করতেই চেয়ারের ঘায়ে লুটিয়ে পড়ল। একশ বিশজন ক্রুদ্ধ মানুষের সামনে সাত আটজন কি করবে। বিশেষ করে ওরা ত এই ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কেউ রিভলভার নিয়ে আসে নি।

একশ বিশজন মানুষ নিজেদের অবস্থা বুঝতে পেরেছে বলে সবাই রাগে টগবগ করছে—হয়ত চেয়ার দিয়ে মেরে ওদের শেষই করে ফেলত। ঠিক এমনই সময়ে মুক্তা এক গাদা দড়ি হাতে দৌড়ে এসে আমার পাশে দাড়াল। আমি তখন দড়িগুলো হাতে নিয়ে গিয়ে বললাম—ভদ্রগণ আপনারা সবাই শিক্ষিত মানুষ। আইন নিজের হাতে নিয়ে নিজেদের ছোট করবেন না। ওরা আমাদের উপরে নির্মম ব্যবহার করেছে তাও ঠিক তবে আমরা ওদেরকে সরকারের হাতে তুলে দিতে চাই—এই নিন দড়ি ওদের বেঁধে ফেলুন। দৌড়ে গিয়ে সেভোন তরঙ্গের সুইচ অফ করে দিলাম।

ওরা তখন জোহান, হেরফেন, রুডলফ, ডাগরি রাইক এবং আর যে কয়েকজন ছিল সবাইকে পিঠমোরা দিয়ে বেঁধে ফেলল।

আমি ওদের সম্বোধন করে বললাম—ভদ্রগণ এই পিশাচেরা আমাদের বন্দী করেছিল আজ ওরাই আমাদের হাতে বন্দী। হিন্দুদের

মহাভারতে আছে জরাসন্ধ নামে এক শক্তিশালী রাজা অনেক রাজাকে বন্দী করে রেখেছিল। পরে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের হাত দিয়ে জরাসন্ধকে পরাস্ত করে সব রাজাকে উদ্ধার করেছিলেন। আজ ঈশ্বর আমার হাত দিয়ে আপনাদের উদ্ধার করলেন। আগে আমরা এই নরক থেকে বের হই। তারপর সব বুঝিয়ে বলব। আরও অনেক কাজ আছে—আপনাদের চুক্তিমত অনেক টাকা পাওনা হয়েছে—আগে বের হয়ে পুলিশ নিয়ে আসি পরে আইন মাফিক কাজ করেই আমার আমাদের পাওনা টাকা নিয়ে নেব। ভদ্রগণ আপনারা রাজী—

নিশ্চয় রাজী—আমাদের মনে হচ্ছেএকটা স্বপ্নের পরে জেগে উঠেছি। মাননীয় শিক্ষক ডাঃ বাগচী আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি বললাম—আপনাদের আবার পূর্ব জীবনে ফিরিয়ে আনবার সাহায্য করেছি—এই জন্যই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—হের চেস একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলেন ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করতে পারে না। আজ দেখুন ঈশ্বর রক্ষা করেন কিনা আর হেরম্যান জোহান আপনার কাজ ছকে কাটা, নির্ভুল ফরমুলায় বাঁধা থাকে—একদিন বলেছিলাম—একটা ভুলই হয়েছে এই বাগচীকে নিয়ে এসে রোবোট করবার প্রচণ্ড ইচ্ছা। মুক্তা—এই গোলক ধাঁধার দরজা খোলবার সংকেত একমাত্র তুমিই জান। আর যারা জানে তারা ত বন্দী। এবার পথ দেখাও। মুক্তা তখন কাঁপছে। দুহাতে চোখ ঢেকে বলে উঠল ওঃ বাগচী—এও সম্ভব হতে পারে। হ্যাঁ পারে। —আমি ওকে সান্তনা দিয়ে বললাম কোন ভয় নেই—এবার পথ দেখাও। শেষে দরজা খুলে বের হতেই আর এক বিস্ময়। বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে স্বয়ং মামুদরে দরজার সামনে হাজির। আমার সেই উড়ো চিঠি ওঁর হাতে পড়েছে। আমাকে দেখে মামুদরে দৌড়ে এসে বলল—আঃ বাগচী তুমি তাহলে বেঁচে আছ।

আমি বললাম—আপনাদের এবং খোদার দোয়ায় বেঁচে আছি। তাহলে এখন চলুন। কয়েকজন পুলিশ এখানে পাহারায় থাকুক। আমি গিয়ে প্রধান অফিসারের কাছে সব কথা বলি। কয়েকজন

পুলিশ পাহারায় থাকল। আর আমি সকলের আগে আগে সেনাপতির মত বুক ফুলিয়ে চললাম।

* * *

সেই পাগলা গারদে অর্থাৎ জোহানের নরকে বিচার সভা বসল। আমি মুক্তার সাহায্য নিয়ে সমস্ত বিভাগ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালাম। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। একশ বিশজন মানুষ রোবোট সব কথা শুনে কেঁদে ফেলল—তাদের চুক্তি পত্রগুলো অফিসে পাওয়া গেল। জোহানের সেই গুপ্ত ভাণ্ডার আমার দেখা ছিল। তা খুলে কয়েক কোটি ডলার পাওয়া গেল। একশ বিশজনকে তাদের পাওনা বেতন এবং আরও কিছু দেওয়া হল। মুক্তার সমস্ত জীবন যাতে নির্বিঘ্নে চলে যায় তারজন্য তাকে অনেক ডলার দেওয়া হল। কর্তৃপক্ষ আমার ব্যাংকেও কয়েক হাজার ডলার জমা দিলেন। তাছাড়া এতসব নরকের রহস্য ভেদের জন্য আমাকে বীর পদক দেওয়া হল। আর জোহান হেরচেস প্রমুখ সবাইকে গণতান্ত্রিক জার্মান রিপাবলিকের হাতে বিচারের জন্য সঁপে দেওয়া হবে এই স্থির করে বন্দী করে রাখা হল। কয়েক লক্ষ ডলার সেজন্য রাখা হল। বাকী ডলার কর্তৃপক্ষ বাজেয়াপ্ত করে নিলেন। বিচার শেষে আমার বাসায় ফিরে এলাম। মুক্তাকেও নিয়ে এলাম।

দু এক দিন বিশ্রামের পর কলেজে গিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করলাম।

বললাম বিজ্ঞানীর প্রতিভা নিয়ে হেরম্যান জোহান জন্মেছিল। নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের একজন। কিন্তু দেখ বিপথে চললে বিজ্ঞান মানুষকে শয়তানে রূপান্তরিত করে এই শিক্ষাই তোমরা নিও। মামুদকে বললাম—দোস্ত তোমার কথা ভুলতে পারবনা। আমি এবার দেশে যাই তবে কায়রো আমাকে যা দিল এ আমার চিরদিনের সঞ্চয়।

* * *

নির্দিষ্ট দিনে সবাই যার যার দেশে রওনা দিল। বিমান বন্দরে সবাই আমাকে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বিদায় জানাল।

মুক্তার ব্যবস্থা এই কয়েকদিনে আমার বন্ধু হাইডেলবুর্গের বিজ্ঞানী এডলফ হানসের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে স্থির করেছিলাম। মুক্তার বাবা ডুয়েটসারকে হানস চিনতেন তাই ওর ব্যবস্থা করতে আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করেছেন।

মুক্তা বলল—ডাঃ বাগচী আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমার জীবনের অনেকটাই ঐ গোলক ধাঁধায় কেটে গেল জানি না এর পরে কি করতে পারব। তবুও মুক্ত জীবনের স্বাদ আপনার হাত থেকেই এল। এতদিন আমার নাম আপনাকে বলিনি যাবার সময় বলি আমার নাম পলিন।

আমি বাধা দিয়ে বললাম না—আমার ভাবীদিনের কাহিনীতে তুমি মুক্তা হয়েই বেঁচে থাকবে। পলিনে আমার দরকার নাই।

ওরা সবাই গিয়ে এরোপ্লেনে উঠল। একটু পরেই গর্জন করে এরোপ্লেন আকাশে উঠল—মুক্ত আকাশের বুক চিরে নূতন করে মুক্ত মানুষগুলোর আনন্দধারা যেন গলে গলে আমার মনে জমা হতে লাগল। আমি আনন্দে ভরপুর হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইলাম।

———